ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ।। ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১৫ জুন, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

ত্রাণ-সামগ্রী লুঠ করছে বাংলাদেশী হার্মাদরা

গূঢ়পুরুষ।। আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবনের শতাধিক গ্রামের মানুষ বাঁচার আশায় নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে এখন সরকারি-বেসরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। আর এই সুযোগে বাংলাদেশী জলদস্যুরা অবাধে বানভাসি গ্রামের পর গ্রামে বেপরোয়া লুঠপাঠ চালাচ্ছে। বাংলাদেশ সীমান্তে প্রহরারত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং সুন্দরবনের জল পুলিশ এখন ত্রাণ ও উদ্ধার-কাজে ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশী হার্মাদদের বাধা দেওয়ার কেউ নেই। বেপরোয়া এই বিদেশি হার্মাদরা জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে ত্রাণবাহী ট্রাকের কনভয় আটক করে লুঠ করছে। বাসন্তী-সোনাখালি-গটখালি এলাকায় বেসরকারি ত্রাণ লুঠের একাধিক ঘটনা ঘটেছে।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার উত্তর আখড়া হাইস্কুলে এবং বাসন্তীতলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবির গত ২৪ মে থেকে চালাচ্ছেন। স্বয়ংসেবকরা নদী পথে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে-গ্রামে ঘোরার সময় বাংলাদেশী ডাকাতদের হামলা ও লুঠপাটের অসংখ্য ঘটনার কথা নিঃসম্বল গ্রামবাসীদের মুখে শুনেছেন। সকলেই এক বাক্যে বলেছেন, এই হার্মাদ জলদস্যুরা প্রথমে নিজেদের ত্রাণ কর্মী বলে পরিচয় দেয়। বাংলাদেশ থেকে তারা পানীয় জল ও চিঁড়ে-মুড়ি এনেছে বলে দাবি করে নৌকা থেকে নেমে গ্রামে ঢোকে। তারপরই তারা স্বমূর্তি ধারণ করে ডাকাতি শুরু করে। আর্ত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ত্রাণের চাল, চিঁড়ে সবই কেড়ে নেয়।

বসিরহাট মহকুমার দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার দেবাশিস ধর বাংলাদেশী ডাকাতদের হামলার কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, এই হার্মাদরা ঝড়ে বিধ্বস্ত গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ছুতোয় আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে ডাকাতি করছে। প্রথম দিকে এদের আসল মতলবটা বোঝা যায়নি। উল্টে বাংলাদেশীদের মানবিকতায় স্থানীয় মানুষ আপ্লুত হয়ে তাদের স্বাগত জানিয়েছে। গত ২ জুন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য হিঙ্গলগঞ্জ পরিদর্শনে এলে সরকারি ত্রাণ কর্মীরা বাংলাদেশীদের পানীয় জল গ্রামে-গ্রামে বিতরণের কথা বলেন। ইছামতী নদীর ওপার থেকে বাংলাদেশীদের নৌকায় জল নিয়ে আসার প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সফর-সঙ্গী এই সাংবাদিকরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বাংলাদেশীদের মানবিক সাহায্যের কথা ফলাও করে লেখেন। পরে জানা যায় জল নিয়ে আসা এই বাংলাদেশীরা আদতে জলদস্যু। ত্রাণ নিয়ে যাওয়া স্বয়ংসেবকরা জানিয়েছেন, সুন্দরীখালি, ট্যাংরামারি, বামনখেরি, সোনাখালি, বাসন্তী, কুলতলি, গোসাবা, হেমনগর ইত্যাদি গ্রামে গিয়ে বাংলাদেশী ডাকাতদলের লুঠপাটের খবর শুনেছেন।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশী ডাকাতরা ছোট-ছোট দেশি নৌকায় চড়ে রাতের

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়লা ত্রাণে শুরু থেকেই নেমেছে আর এস এস

নিজস্ব সংবাদদাতা।। প্রায় জনা পঞ্চাশেক স্বয়ংসেবক বেপরোয়াভাবে কালিন্দী ও রায়মঙ্গল নদী পার হয়ে পৌঁছে যান চব্বিশ ঘণ্টা ত্রাণ না পৌঁছনো সুন্দরবনের মানুষদের কাছে! যে সময়ে তাঁরা পৌঁছান তখন হাওয়ার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৬০ কিমিরও বেশি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৬ টন ত্রাণসামগ্রী সমেত নৌকা বোঝাই করে আর এস এস কর্মীরা পৌঁছে যান জেটিঘাট, হেমনগর, মন্দিরঘাট ও পারঘুমতা গ্রামে। সেখানে তখনও প্রশাসন যেতে পারেনি, কারণ সাইক্লোন মূল রাস্তা থেকে ওই গ্রামগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

প্রশাসনিক অপদার্থতায় তিনদিন না খেতে পাওয়া মানুষদের মুখে অন্ন ও পানীয় যোগানোর প্রাথমিক দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিল স্বয়ংসেবকরাই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সেই চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণাতেও। সেখানকার জেলা কার্যবাহ সুকুমার বৈদ্যের উদ্যোগে একদল তরুণ স্বয়ংসেবক দশা নদীর তীরবর্তী মানুষের মনে পুনরায় বাঁচার আশা জাগিয়েছেন। যে দশা নদী দুর্যোগের রাতে বন্যায় প্লাবিত করে ঘরছাড়া করেছিল হাজার হাজার মানুষকে।

সব মিলিয়ে স্বয়ংসেবকরা এখনও অবধি ৩২টি ত্রাণশিবির চালাচ্ছেন এবং ৩০,০০০ মানুষের মুখে অন্ন যোগাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পাঁচটি ব্লক, যেমন---হাসনাবাদ, ন্যাজাট, সন্দেশখালি ১ ও ২ এবং হিঙ্গলগঞ্জে স্বয়ংসেবকদের ত্রাণকাজে স্থানীয় মানুষ আশ্বস্ত। আর এস এস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য গত ৩রা জুন হাসনাবাদের আয়লাবিধ্বস্ত এলাকার অধিকাংশ ত্রাণশিবির ঘুরে দেখেন। দেখেশুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া, আর এস এসের স্বয়ংসেবকরা ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে যুঝেও দুর্গতদের পাশে পৌঁছেছেন। গত ২৬ মে সুন্দরবনের বাসন্তী,

(এরপর ৪ পাতায়)

কন্ধমালের বিজেপি এম এল এ-কে মাও হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ওড়িশার কন্ধমালের উদয়গিরি থেকে নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক এল মনোজ প্রধানকে খুনের হুমকি দিল মাওবাদীরা। শুধু মনোজ প্রধানই নন। মাওবাদীদের হিট লিস্টে রয়েছে বজরং দলের চার নেতার নামও। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় এক চার্চের মদতেই মাওবাদীরা এভাবে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে।

মনোজ প্রধানকে হত্যার হুমকি দিয়ে ওড়িশার রাইকিয়াতে হাতে লেখা পোস্টারে উত্তেজনা ছড়ায়। ওই এলাকায় মনোজের ইমেজ অনেকটা রবীন হুডের মতোই। মনোজ প্রধান হলেন প্রয়াত স্বামী লক্ষণানন্দ সরস্বতীর অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম, অগ্রণী। গত বছরের ২৩ আগস্ট চার্চের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের হাতে স্বামীজীর মৃত্যুর পর চার্চের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ মনোজ প্রধানের নেতৃত্বে জন-আন্দোলন গড়ে তোলেন। এতে প্রমাদ গনে চার্চ কর্তৃপক্ষ। তাদের চাপে রাজ্য সরকার গ্রেপ্তার করে মনোজকে। মনোজের বিরুদ্ধে খুন, গৃহদাহ এবং দাঙ্গা বাধানোর মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়।

গত বছরে অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তিনি ভোটে দাঁড়ালেও জেল থেকে মুক্তি পাননি। কিন্তু জনসমর্থনের প্রবল জোয়ার ভোটে জিতিয়ে দেয় তাঁকে। আতঙ্কিত হয়ে চার্চ কর্তৃপক্ষ এরপর শুরু করে চক্রান্তের জালবোনা। মাওবাদীদের দিয়ে এভাবে হুমকি দেওয়া পোস্টার লাগিয়ে দরিদ্র জনজাতিদের মনে ভয় ঢুকিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করাই চার্চের মূল উদ্দেশ্য বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে। প্রশাসনের ভূমিকাটা এখানে একেবারেই নিরপেক্ষ নয়। অভিযোগ, চার্চের সংরক্ষক হিসেবেই কাজ করছে প্রশাসন। গত অক্টোবরের পর থেকে সেখানে কোনও বড় দাঙ্গার খবর না থাকলেও হাতে লেখা পোস্টার এতদিন পর্যন্ত নিষিদ্ধই করেছিল প্রশাসন। রাইকিয়াতে এহেন দুটি পোস্টার সাঁটার ঘটনার কথা কন্ধমালের পুলিশ সুপার প্রবীণ কুমারকে জানানো হলে, তাঁর মন্তব্য, "আমরা এ নিয়ে তদন্ত করব ঠিকই। কিন্তু যদি পরে ফের পোস্টার পড়ে তবেই তদন্ত করব!"

নতুন নামে সক্রিয় লস্কর-এ-তৈবা

বিশেষ প্রতিনিধি।। গত বৃহস্পতিবার ৪ জুন, লস্কর-এ-তৈবার সক্রিয় কর্মী মহম্মদ উমর মাদনিকে দিল্লীর মেহরাউলি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রতি লাহোর হাইকোর্টের নির্দেশে গৃহবন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া এবং ২৬/১১ মুম্বাই কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত লস্করের প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদের সঙ্গে মাদনির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সেই ঘনিষ্ঠতার সুবাদেই হাফিজ মাদনিকে নেপালে লস্করের কাজকর্মের যাবতীয় দায়িত্বভার তুলে দেয়। সেখানে মাদনির প্রধান কাজ ছিল ভারতীয় ও নেপালী যুবকদের মধ্যে জেহাদি কাজের সমন্বয় সাধন করা।

উমের মাদনি

হাফিজ সঈদ

গোয়েন্দাদের জেরার মুখে মাদনি জানিয়েছে, সম্প্রতি পাকিস্তানে জামাত-উদ্-দাওয়া নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। সেখানেই ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপ অব্যাহত রাখতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তার মধ্যে ভারতের দিক থেকে যেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক তা হল, মাদনিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় তিনি যেন অন্ততঃপক্ষে দু'জন শিক্ষিত ব্যক্তিকে ভারতের চার মেট্রো শহর অর্থাৎ দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই এবং চেন্নাই---এ লস্করের জেহাদি কাজকে সক্রিয় রাখার জন্য নিয়োগ করেন। সেখানে এরকমও বলা হয়েছিল---নিযুক্ত ওই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে অবশ্যই কম্পিউটার শিক্ষিত, অপরজনকে নিদেনপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। কন্ধন ও মালাবার উপকূলে লস্কর-এ-তৈবার সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য মৎস্যজীবীদের নিয়োগ করে ট্রেনিং দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয় মাদনিকে। সব মিলিয়ে ওই কথাবার্তায় একটাই লক্ষ্য ছিল যে, জঙ্গি কাজকর্ম অব্যাহত রাখবার জন্য প্রতিভা খুঁজে নিতে হবে অর্থাৎ, Talent hunt-এর কথাই হয়েছিল পাকিস্তানে জামাত-উদ্-দাওয়া নেতৃত্বের সঙ্গে মাদনির সেদিনের কথাবার্তায়।

ইতিপূর্বে ২০০০ সাল নাগাদ পাকিস্তান ভ্রমণের সময় মাদনির সঙ্গে পরিচয় হয়

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

মিশনারী স্কুলের অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে অভিভাবকদের 'হিন্দু বাস্টার্ড' বলার অভিযোগ

প্রাণ প্রতিম পাল ঃ কলকাতা ।। স্কুলের অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাতে গেলে স্কুলের শিক্ষকেরা অভিভাবকদের 'হিন্দু বাস্টার্ড' বলে গালিগালাজ দেয়। এই অভিযোগ উঠেছে বেহালার মেঘমালা রায় এডুকেশন হল-এর বিরুদ্ধে। রাজ্য জুড়ে শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ঘটছে। বিভিন্ন মিশনারী পরিচালিত স্কুলগুলিতে তার প্রভাব চোখে পড়ে। নিজেদের ইচ্ছামতো এইসব স্কুলগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে টিউশন ফি নিয়ে থাকে। বেহালার মেঘমালা রায় এডুকেশন সেন্টার তার ব্যতিক্রম নয়।

মেঘমালা রায় এডুকেসন সেন্টার।

অভিভাবক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা।

বেহালা অঞ্চলের সাধারণ ঘরের ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে স্যার বীরেন রায় তার স্ত্রী মেঘমালা রায়ের নামে স্কুলটি ১৯৯০ সালে দান করেন। লিটিল ফ্লাওয়ার অব ব্যাথানি (ব্যাথানি সিস্টার) দ্বারা এই স্কুল পরিচালিত। অভিভাবকদের অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ সাদা কাগজে নোটিশ পাঠিয়ে ফি বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। ১৯৯৪ সালে মাত্র ৯০ টাকা টিউশন ফি ছিল। ২০০৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬২০ টাকা। ২০০৯ সালে ১০৭০ টাকা। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ, উন্নয়ণ প্রভৃতি খাতের আলাদা-আলাদা অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। মেঘমালা রায় এডুকেশন সেন্টারে কে. জি. ওয়ানে ভর্তির সময় অতিরিক্ত ৫০০ টাকা করে কম্পিউটার কেনার জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। এই বাবদ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাদা কাগজে কোনও স্টাম্প, স্বাক্ষর ছাড়াই রসিদ ইস্যু করে। শুধু তাই নয়, জেনারেটের কেনার জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের ক্ষেত্রে স্কুলের ফি কম থাকলেও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা অস্বাভাবাবিক বেশি বলে মনে করেন গার্জেনস্ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। রোমান ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রে স্কুলের অধ্যক্ষ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা বাড়িতে বুটিক শাড়ির ব্যবসা শুরু করেছেন। সেইসঙ্গে অভিভাবকদের একপ্রকার বাধ্য করাচ্ছেন তাদের থেকেই বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করতে। ২০০৩ সালে এই বিদ্যালয়টি ICSE বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এই গার্জেনস্ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনের সঙ্গে ২৫টির বেশি অভিভাবক সংগঠন এক হয়ে মিশনারী স্কুলের বর্দ্ধিত টিউশন ফি-র বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে।

গত মার্চ মাসে এই আন্দোলন শুরু করেছে এই অভিভাবক সংগঠনটি। রাজ্য সরকার, প্রশাসন, শিক্ষকদেরকে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে মন্তব্য করেন সংগঠনের সহ-সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ। তিনি বলেন, আমরা আজ কোন সমাজে বাস করছি। মেঘমালা স্কুলে দ্বাদশ উত্তীর্ণ শিক্ষকও রয়েছেন। যারা ক্লাস টেনের ছাত্রদের ইংরেজি পড়াচ্ছেন। এরাই আবার আমাদের বলছেন ভিখারি, অশিক্ষিত।

এপ্রিল মাসে অভিভাবক সংগঠনের পক্ষ থেকে স্কুলের অধ্যক্ষ সিস্টার এডেনবার্গের সঙ্গে আলোচনায় বসে মধ্যস্থতা করেন বেহালা থানার সাব ইন্সপেক্টর বিকাশ দে। কিন্তু স্কুলের অধ্যক্ষ আলোচনায় বসলেও তিনি ফি বৃদ্ধির বিষয়ে তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এপ্রিল মাসের শেষে প্রায় তিন ঘণ্টা রোদে অপেক্ষা করিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হন অধ্যক্ষ সিস্টার এডেনবার্গ। তিনি বলেন, সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সমান বেতন দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে। এই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে টিউশন ফি বাড়িয়েছি। তবে এটা আমার সিদ্ধান্ত নয়। আমাদের স্কুল ইন্সপেক্টর মলয় ভিকস্টার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকারি নোটিশ এর ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে কোনরকম পরিস্থিতির মোকাবিলায় স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দেয়। টানা ২ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও বৈঠকে অভিভাবকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করে। বিরক্ত হয়ে থানার ওসি সুবীর রায় বাইরে বেরিয়ে আসেন। হল ঘর মিটিং চলাকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের পাখা-লাইট বন্ধ করে প্রচণ্ড গরমে দু'হাত ওপরে তুলে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ দেন শিক্ষকরা। ভূতের মুখোশ পরে নীচু ক্লাসের ছাত্রদের ভয় দেখানো হয়। শিক্ষকরা অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছেলেমেয়েদের এমনই শাস্তি পেতে হবে। শিক্ষকদের অমানবিক আচরণে ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভয়ে স্কুলে যেতে চাইছে না তারা। এমন অবস্থায় এখানে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে এক নোটিশে জানিয়েছেন, অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা না করে বিদ্যালয়ের ফি বৃদ্ধি করা যাবে না। শিক্ষামন্ত্রীর এই আদেশকে কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সিস্টার এডেনবার্গ। এ মাসে (৮ জুন) আবারও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল অভিভাবক সংগঠনের। কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়।

ওয়েলফেয়ার সংগঠনের মুখপাত্র সুপর্ণা দাস বলেন, গরমের হাতে থেকে বাঁচার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে জেনারেটর কিনবে বলে টাকা চায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আমরা সেই টাকা (প্রায় ৭০০ টাকা) দিয়েও দিই। কিন্তু গরমে আমাদের বাচ্চারা কষ্ট পায়। কিন্তু জেনারেটর লাভ নিয়ে অধ্যক্ষা সিস্টার এডেনবার্গ ও অন্যান্য নান-রা ঠান্ডা ঘরে বিশ্রাম করে। পরে আমরা জানতে পারি, অস্ট্রেলিয়ার এক সংস্থা ওই জেনারেটর ডোনেট করে।

সংগঠনের পক্ষে সুজিত কুমার দাস বলেন, এই বিদ্যালয়ের মাসিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা। কিন্তু খরচ ৫ লক্ষ টাকার মতো। বাকী টাকা কোথায় যায় সেটাই রহস্য। আমরা বিদ্যালয়ের খরচের হিসাব চেয়েছি। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করে। সংগঠনের আহ্বায়ক সুবীর দে বলেন, যতদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ অস্বাভাবাবিক ফি না কমাবে, ততদিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

মিশনারীরা যতই সেবার কথা বলুক না কেন, তাদের স্বভাব চরিত্র আসলে যে কী মেঘমালা রায় এডুকেশন সেন্টারের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর অমানবিক অত্যাচারই তার প্রমাণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতায় সভ্য অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে মিশনারী স্কুলে পড়াতে মরিয়া।

এই সময়

এক ঘণ্টা

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। পাল্টে যাচ্ছে জনগণের সময়। ১৯ জুন থেকে সেদেশে এগিয়ে যাচ্ছে ১ ঘণ্টা সময়। তবে কি পঁচিশ ঘণ্টায় দিন-রাত। না, তা নয়। ১৯ জুন থেকে বাংলাদেশের অফিস-কাছারি খুলবে এক ঘণ্টা আগে। আবার বন্ধও হবে এক ঘণ্টা আগে। সময়ের সঙ্গে এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকতেই এই ব্যবস্থা।

বড় ভুল

শুরুটা ছিল তাদের। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণের নামে জননিধনও তাদেরই সৃষ্টি। এরপর পরমাণু চুক্তির ইস্যুতে সমর্থন প্রত্যাহার। সেটাও তাদের। অবশেষে তৃতীয় ফ্রন্টের উদ্ভাবন। বিগত কয়েক বছরে এসবেরই সৃষ্টিকর্তা বামপন্থীরা। কিন্তু সফলতা আসেনি কোনওক্ষেত্রেই। উল্টে দেশজুড়ে বামপন্থীদের অবস্থা হয়েছে বেহাল। এসমস্ত সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক ভুল' না বললেও, বড় ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করলেন সি পি আই নেতা এ বি বর্ধন। দেশজুড়ে তাদের এই করুণ পরিস্থিতির পিছনেও এই ভুলগুলি কাজ করেছে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

আপত্তি নেই

দেশজুড়ে ধূমপান বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন সময়েই নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেন খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সিনেমার দৃশ্যে ধূমপান বন্ধ রাখার কথা যখন সবাই বলছেন, তখন গুলাম নবী আজাদ চলচ্চিত্রে ধূমপানে কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন। তাঁর এই ধরনের মন্তব্যকে মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। অনেকের মতে, দেশজুড়ে ধূমপান প্রতিরোধে যখন লড়াই চলছে, সেখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর মানসিকতা তাতে কিছুটা হলেও, নিরাশার সৃষ্টি করবে।

চর বৃদ্ধি

চর বাড়ছে দাউদের। মাফিয়া ডন দাউদ বহুদিন খবরে না থাকলেও, বিগত কয়েক বছরে তলায়-তলায় চর বেড়েছে তার। দাউদের ছায়া সঙ্গী ছোটা শাকিলেরও চরের সংখ্যা দেড়শোর ওপর বেড়েছে। তারা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি গুলশন কুমারের হত্যা কাণ্ডে ধৃত আব্দুল রউফ-এর গ্রেপ্তারের পরই, এই তথ্য সামনে আসে। দাউদ তার এজেন্টদের মোটা টাকা দিয়ে পুষছে বলেও খবর। বাংলাদেশ কিন্তু এই ঘটনা অস্বীকার করেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা এটা হালকাভাবে নিতে রাজি নয়। দাউদের এজেন্ট বৃদ্ধির খবরকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না তাঁরা।

সুবিচার

এখনও জোটেনি সুবিচার। ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা আজও বঞ্চিত। বঞ্চিতনায্য ক্ষতিপূরণ থেকেও। দীর্ঘ ২৫ বছর পার হতে চলেছে, তবুও হাজার-হাজার শিখ পরিবারের কপালে পাওনাটুকুও জোটেনি। ১৯৮৪ সালের ওই ঘটনায় প্রায় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদেরও মদত ছিল। প্রত্যক্ষ যোগসাজস ছিল হরকিষণলাল ভগত, সজ্জন কুমার, জগদীশ টাইটলারের মতো নেতাদের। নানাবতী কমিশনের দাখিল করা রিপোর্টও অনেক বছর হয়ে গেছে। অপরাধীরা দিব্যি গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনমোহন সিং দিল্লীর মসনদে। তবুও ন্যায় বিচার জুটছে না শিখদের।

মুছে যাওয়া দিন

অনেক স্মৃতি আঁকড়ে ছিলেন তিনি। ১৯১২-র সেই অভিশপ্ত দিনটিকেও কাছ থেকে দেখেন। টাইটানিক জাহাজের মধ্যে তিনিও ছিলেন যাত্রী হিসাবে। মিলভিনা ডীন সব স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। টাইটানিকের ভরাডুবির শেষ জীবিত যাত্রী গত ১ জুন ৯৭ বছর বয়সে চলে গেলেন, টাইটানিকের স্মৃতি নিয়ে।

নতুন অস্ত্র

আল কায়দার বিনাশে নতুন অস্ত্র হাতে নিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ব্যবহার করা হবে রহস্যময় এক মুদ্রা। এই নতুন অস্ত্রই বলে দেবে আল কায়দার গতি বিধি। তবে পুরোটাই করবে স্থানীয় উপজাতি মানুষ। টাকার বিনিময়ে (মুদ্রা) তাদের ব্যবহার করছে সি আই এ। উপজাতি মানুষদের শুধু তালিবানী ও আল কায়দাদের ডেরায় বসাতে হবে ট্রান্সমিটার। যা থেকে তাদের গতিবিধি জানতে পারবে মার্কিন গোয়েন্দারা।

কৃষিতে শীর্ষে

আবারও শীর্ষে গুজরাট। কৃষিক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গুজরাটের উন্নয়ণ বিগত কয়েক বছরে সব থেকে বেশি হয়েছে। সম্প্রতি 'ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট'-এর রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। গুজরাটের সেচ ব্যবস্থাতেও যথেষ্ট উন্নয়ণ হয়েছে বলে রিপোর্টে ধরা পড়েছে। কৃষিতে সরকারের উন্নয়ণের হার ৯.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। এই রিপোর্টে আবারও নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ণের চিত্র ধরা পড়ল।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অস্ট্রেলিয়ায় কেন এই বর্বরতা?

গত কয়েকদিন যাবৎ অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হইয়াছে ভারতীয় ছাত্রনিধন যজ্ঞ। রাস্তা-ঘাটে এমনকী ট্রেনের মধ্যেও ভারতীয় ছাত্রগণ আক্রান্ত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার তো বটেই, গোটা অস্ট্রেলীয় সমাজই কেন জানি না নিরুদ্বেগ হইয়া রহিয়াছে। গোটা ভারতীয় সমাজেও উদ্বিগ্নতার প্রমাণ মিলিতেছে না। খবর শুধু খবরের কাগজেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ভারত সরকার যতটা তড়পাইয়াছে ততটা কিছুই করে নাই। বিবৃতি একটা দিয়াছে বটে, তবে ঝাঁজ তাহাতে কিছুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। অস্ট্রেলিয়া সরকারও দায়সারা গোছের একটা বিবৃতি দিয়াছে। তবে তাহাতে আশ্বস্ত হইবার মতো কিছু নাই। ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের একটা বিবৃতি দিয়াছে। প্রথমে তো অস্ট্রেলিয়া সরকার সব কিছু অস্বীকারই করিয়াছিল। পরে ভারতীয় ছাত্রদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে পড়িয়া কিছুটা ঢোক গিলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু স্বীকার করা আর অস্বীকার করার মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য আছে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ যাহা হইবার তাহা তো সমানে হইয়াই চলিয়াছে।

কেন এমন হইতেছে? তবে কি অস্ট্রেলিয়ার আদি জনগোষ্ঠীর রক্তে এই আদিমতা পূর্ব হইতেই ছিল? অস্ট্রেলিয়ার জনগোষ্ঠীর আদি ইতিহাস বিষয়ে এখনও যাহা জানা যায়, তাহাতে ইহা পরিষ্কার যে, আজকের অস্ট্রেলীয়রা অতীতের সেই বৃটেনবাসীদেরই বংশধর, যাহারা নানান অকর্ম-কুকর্ম করিবার জন্য বৃটেন হইতেই বিতাড়িত হইয়াছিল। এবং তাহাদের প্রজন্মই আজকের এই অস্ট্রেলিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের রক্তের মধ্যে নিহিত সেই আদিমতা ও বর্বরতা আজকের অস্ট্রেলিয়ানরা বহন করিয়া চলিয়াছে। আজকে তাহাদের এই বর্বরতা ও আদিমতা সেই জিনগত সমস্যা। বৃটিশ জাতও বিভিন্ন অ্যাংলো-স্যাক্সন উপজাতিদের এক মিশ্রণ মাত্র। তাহাদের রক্তেও রহিয়াছে এই আদিমতা, বর্বরতা ও অমানবিকতা। এই উপজাতিদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, নৃশংস আচরণ ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। যে বৃটিশ জাতির রক্তেই রহিয়াছে এই বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা, তাহাদের ঔরসজাতরা আরও অসামাজিক। নিষ্ঠুরতায়, নির্মমতায় ও অমানবিকতায় তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

এই উদগ্র অসামাজিক গোষ্ঠীই বিতাড়িত হইয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এই অস্ট্রেলিয়া সামাজিক গোষ্ঠী। ইহাদের কাছে যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ঘটাইতেছে। ভদ্রলোকের খেলা বলিয়া পরিচিত ক্রিকেট-এর মাঠেও আমরা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদেরও এই আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একেবারে সম্প্রতি ইংল্যান্ডে টোয়েন্টি-২০ বিশ্বকাপ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে অস্ট্রেলিয়ার অল-রাউন্ডার অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস। অভিযোগ তিনি অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিলেন।

ইহার পূর্বেও এইরকম বহু অসামাজিক কাজে তাহার লিপ্ত থাকার অপরাধের ঘটনার কথা আমরা জানি। এইসকল ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার উপরোক্ত নৃতত্ত্বের সারবত্তাই প্রমাণ করে।

এ তো গেল অস্ট্রেলিয়ার নির্মমতার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কিন্তু ইহাও সত্য যে ভারত সরকার ও ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলিও এই ঘটনার বিরুদ্ধে জনজাগরণ ঘটাইতে পারে নাই বা করে নাই। ভারতের নাগরিক, সে বিশ্বের যে কোনও দেশেই হোন না কেন, যদি আক্রান্ত হয়, তবে তাহাদের রক্ষা করিবার ভার ভারত সরকারেরই। ভারত সরকার যদি এই কাজ সক্রিয়ভাবে করিতে সচেষ্ট না হয়, তবে সেই সরকারকে এই কাজে বাধ্য করানোর দায়িত্ব কাহার? নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক দলগুলোরই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হইল, দেশের রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান তথা স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করিতে খুব একটা সময় নষ্ট করে না। কমিউনিস্টরা তো আর এক কাঠি ওপরে। তাহাদের দৃষ্টিতে বিশ্বের কোনও দেশে ভারতীয় হিন্দুরা আক্রান্ত হইলে সেটা সেই দেশের নিপীড়িত মানুষের শ্রেণী সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু হিন্দুরা প্রতিরোধ গড়িলেই তাহা তাহাদের মতে একটা নিদারুণ সাম্প্রদায়িকতা। স্বাভাবিকভাবেই জনগণও জাতীয়তাবোধে আপ্লুতও নয়।

যখন সারা বিশ্ব (ওয়ান ওয়ার্ল্ড) একই পরিবারভুক্ত বলিয়া ধারণা গড়িয়া উঠিতেছে সেই সময়ে বর্ণভেদের বৈষম্য অস্ট্রেলিয়ায় পরিলক্ষিত। ভারতবর্ষেও অনেক অস্ট্রেলিয় নানাকারণে থাকেন এবং পর্যটনে আসেন। ভারতে কিন্তু প্রতিশোধ অথবা ঠিক উলটো প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই। কারণ ভারতীয় সমাজ, দর্শন প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করে না। অস্ট্রেলিয়ার ঘটনা প্রমাণ করিয়াছে শিক্ষা-দীক্ষা, শরীরের ফর্সা রং মনের কালো ঘুচাইতে পারে নাই। কান্তকবি যথার্থই গাহিয়াছেন---'সবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না।' অস্ট্রেলিয়ায় যেভাবে পরের পর ঘটনা ঘটিতেছে, শীঘ্রাতিশীঘ্র ভারত সরকারের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ এই মুহূর্তে তাই একান্ত কাম্য।

এখনও কি ঘুম ভাঙবে না?

তথাগত রায়

মানুষের যে নানারকম রোগ হয় তার মধ্যে কিছু রোগ মানুষ অনায়াসে স্বীকার করে উপযুক্ত চিকিৎসায় ব্রতী হয়---ফলে সেই রোগ সারবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। অপরপক্ষে, কিছু রোগ মানুষ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে----স্বীকার করে না, গোপনে নিজে চিকিৎসা করার চেষ্টা করে। ফলে এই সব রোগ কালক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে। তখন চিকিৎসা কঠিনতর হয়। এমন অসুখের উদাহরণ---কুষ্ঠ, নানা যৌনরোগ, মানসিকরোগ। একটু ভাবলে দেখা যাবে, এগুলি লুকোবার কোনও কারণ নেই, তবু লুকিয়ে রেখে মানুষ সমস্যা সৃষ্টি করে।

মানুষের দেহে যেমন রোগ হয়, তেমনি উগ্রপন্থা বা সন্ত্রাসবাদ ভারতের রাষ্ট্রদেহে একটি রোগ। এই রোগ লুকোবার উপায় নেই। কিন্তু এর চিকিৎসা কতদূর প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তথ্য লুকিয়ে চূড়ান্ত ভন্ডামি করার সুযোগ আছে। এবং এই ভন্ডামিই ভারতে হয়ে চলেছে, এক অদ্ভুত 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বা 'সেকুলারবাদ' নামক দোষ, আমরা সব জেনেও ন্যাকা সাজি, 'অস্বস্তিকর' সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাই, যার ফল হয় শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রের ক্ষতি। অতএব নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হয়ে এর জবাব দিতে হবে, দিতেই হবে ঃ---

১। এই উগ্রপন্থীরা মূলত কারা?

২। কেন এরা এই উন্মাদের মতো আচরণ করে নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটাচ্ছে?

৩। এদের মোকাবিলা করতে গেলে রাষ্ট্রশক্তির কি করা প্রয়োজন?

৪। কেন রাষ্ট্র তা করছে না বা করতে পারছে না?

৫। যদি এমনিধারাই চলতে থাকে তাহলে তার পরিণতি কী?

আজ পর্যন্ত যে হাজারের ওপর মানুষ এই ভারতে উগ্রপন্থী হানায় প্রাণ হারিয়েছেন এবং আরও কয়েক হাজার পঙ্গু হয়ে জীবনযাপন করছেন। তাঁদের আততায়ী ছিল কোনও না কোনও জঙ্গি ইসলামী বা জেহাদী গোষ্ঠী---একথা অস্বীকার করার নিশ্চয়ই কোনও জায়গা নেই। জানি, এই কথা শুনলেই বেশ কিছু লোক লাফ দিয়ে উঠবেন, "কেন, মালেগাঁওয়ের হিন্দু উগ্রপন্থীরা! কেন, শিখ উগ্রপন্থীরা!" এই সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব দেওয়া যাবে, কারণ সংখ্যার দিক দিয়ে লস্কর-এ-তৈবা, জৈশ-এ-মহম্মদ, সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, এবং মুম্বাইয়ের সাম্প্রতিকতম আততায়ীরা যে পরিমাণ মৃত্যু ঘটিয়েছে তার সঙ্গে মালেগাঁও বা শিখ উগ্রপন্থা (যা মূলত ছিল পাকিস্তানী সাহায্যপ্রাপ্ত) কোনও তুলনাই চলে না। তা ছাড়া শিখ উগ্রপন্থা শেষ হয়ে গেছে, এবং মালেগাঁও-এর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কিছুই প্রমাণ হয়নি। যদি প্রমাণ হয়ও তা হলেও একটি ঘটনা থেকে কোনও 'প্যাটার্ন' কখনওই পাওয়া যাবে না, এটিকে আপাতত একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেই ধরতে হবে। অপরপক্ষে, যে ইসলামী উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির কথা উপরে বলা হয়েছে, তাদের কার্যকলাপ কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? অবশ্যই নয়। এবং আজকে আমরা স্থিরনিশ্চিত যে, এই নরপশুরা খুব শিগগিরই আবারও এই রকম একটা ঘটনা ঘটাবে----যদি আমরা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সজাগ না হই।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং কঠিনতম প্রশ্ন। কঠিন এই জন্য নয় যে, এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কঠিন এই জন্য, যে খুঁজে পাওয়া উত্তরের মুখোমুখি হতে অনেকেই চাইবেন না।

যে উগ্রপন্থীরা ৯/১১-র বিমান দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল, যে উগ্রপন্থীরা মুম্বাইতে তাজমহল বা ট্রাইডেন্ট হোটেল আক্রমণ করেছিল, তারা সবাই জানত তারা বেঁচে ফিরবে না। এত লোককে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা কি সহজ কথা? কি করে সেটা করা যায়? এর একমাত্র উত্তর, ধর্মীয় উন্মাদনা থেকেই এটা করা যায়, অন্য কোনও উপায়ে করা অসম্ভব। রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে এটা করানো অসম্ভব, আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। এটা পেরেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার জাপানী 'কামিকাজে' (Kamikaze) পাইলটরা, যারা তাদের সম্রাটের নাম করে এরোপ্লেন নিয়ে মরণঝাঁপ দিত কারণ তারা সম্রাটকে ঈশ্বর বলে মানত। দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানাতে কয়েক বছর আগে বিশাল সংখ্যক মার্কিন অপধর্ম (cult) অনুসারীরা (তাদের গুরু সমেত) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল---এমন নজিরও আছে। কিন্তু ইদানীংকালের পৃথিবীতে যারা এই ধরনের আত্মহত্যায় ঝাঁপ দিয়েছে তারা প্রায় সবাই ইসলামি জঙ্গি। তারা তাদের প্রেরণা সংগ্রহ করেছে তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই। এবং তারা এই ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত যে এইভাবে বিধর্মীদের হত্যা করে নিজেরা হত হলে তারা 'শহীদ' হবে এবং শাহাদতের পুরস্কার হিসাবে চিরকালের জন্য সেই স্বর্গবাসী

> **"যখন দেখা যায় জনৈকা ব্রাহ্মণকন্যা (যিনি দিনের বেলায় উপবাস করেননি) তিনি দাঁতে ছোলা চিবিয়ে রোজা রাখছেন এবং দু'হাত খুলে নামাজ পড়ার ভঙ্গি করছেন, তখন গীতার উপদেশ মনে পড়ে—"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ / স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ"।**

ধবজার আড়ালে, যা এই সন্ত্রাসবাদের রাস্তা উন্মুক্ত করেছে। এবং যার শেষতম ও করুণতম ফলশ্রুতি হচ্ছে মুম্বাইয়ে উগ্রপন্থী আক্রমণ। যাতে ভারতের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র দু'দিনের উপর অচল হয়ে গেছে। একশো চল্লিশজন (এই লেখার সময় পর্যন্ত) নিরপরাধ নিরীহ সাধারণ মানুষের প্রাণ গেছে, তিনশোর ওপর মানুষ গুরুতরভাবে আহত। এর মধ্যে কত কচি শিশু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, কত অবোধ বালক-বালিকা অনাথ, কত তরুণী অকালে বিধবা, কত মা'র কোল খালি হয়ে গেছে তার হিসেব কোনদিন কি পাওয়া যাবে?

ভারতে উগ্রপন্থী আক্রমণ নতুন কিছু নয়, বরঞ্চ খানিকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে--যে হতভাগ্যরা এর বলি হয়েছে তাদের পরিবার ছাড়া কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশের মঙ্গলকামী কোনও মানুষেরই তো এরকম ব্যাপার---যাতে কিছু বন্দুকধারী দুষ্কৃতী রাষ্ট্রশক্তিকে চরম অবজ্ঞা করে নিরীহ মানুষকে খুন করতে পারে---গা-সওয়া হতে দেওয়া উচিত নয়। মুম্বাইতে যা ঘটেছে তার তীব্রতা সম্বন্ধে কারুর আন্দাজ আগে থেকে না থাকতে পারে, কিন্তু যে ভাবে এর আগে দিল্লী, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর এবং মুম্বাইয়েরই ট্রেনে উগ্রপন্থীরা পরের পর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাতে এই সাম্প্রতিকতম উগ্রপন্থী হানা যে অপ্রত্যাশিত ছিল তা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না!

এই সমস্যাটার যদি সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরও খুঁজতে হবে---এবং উত্তর পেলে সেটা অপছন্দ হচ্ছে বলে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। বস্তুত আমাদের এইটেই সবচেয়ে বড় হবে, যেখানে সপ্রচুর হুরী (চিরযৌবনা আনতনয়না কুমারী) এবং যার নীচে দিয়ে নদী প্রবাহিত ইত্যাদি। (কোরান ২ : ১৫৪, ৩ : ১৯৫, ৯ : ১১১, ২২ : ৫৮, ৪৭ : ৪-৬ এবং অন্যান্য)

এই সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হওয়া সহজবোধ্য কারণেই, কোনও রাজনীতিকের পক্ষে আদৌ সহজ নয়। কিন্তু মুখোমুখি না হলে কি সমস্যার সমাধান হবে? কোনওদিনই হবে না, আরও উগ্রপন্থী হানা হবে, আরও নিরীহ মানুষ মারা যাবেন, প্রধানমন্ত্রী আরও অর্থহীন স্তোকবাক্য আওড়াতে থাকবেন।

এবার তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তরও কঠিন নয় কিন্তু সেই সমস্যার মুখোমুখি হওয়া কঠিন। যারা ইসলামে বিশ্বাস করেন তাঁরা কিছু ধর্মগুরুদের মানেন---যেমন দেওবন্দ (উত্তরপ্রদেশ)-এর দারুল উলুম নামক ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুরা, অথবা স্থানীয় মসজিদের ইমাম। এইসব ধর্মগুরুদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে এবং তাদের সরাসরি বলতে হবে যে এর এমন ব্যাখ্যা দিন যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের পশ্বাচার না ঘটে। কোরানের কোনও বাক্য মানতে বারণ করা এই সব ধর্মগুরুদের এক্তিয়ারের বাইরে। কিন্তু ব্যাখ্যা বা ফতোয়া তাঁরা নিশ্চয়ই দিতে পারেন। এবং তাঁরা যদি বলেন যে এইরকম নরহত্যা করলে হত্যাকারীরা শহীদ হবে না এবং স্বর্গে যাওয়ার বদলে অনন্ত নরকবাস করবে, যেখানে মহারবে জ্বলন্ত আগুন বিদ্যমান এবং যে আগুনের ইন্ধন মানুষ পাথর। এবং যে আগুন তৈরি হয়েছে (ইসলামে) অবিশ্বাসীদের জন্য (কোরান ২ : ২৪, ২৫ : ১১-১২ ও অন্যান্য) , তাহলে *(এরপর ৮ পাতায়)*

পরলোকে প্রতিমা বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত সঞ্চালিকা শ্রীমতী প্রতিমা বসু পরলোক গমন করেছেন। গত ৫ জুন রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েকমাস ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। স্বামী, এক পুত্র, পুত্রবধূ ও এক নাতনী এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুকে রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ও পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের পূর্বতন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক কালিদাস বসুর তিনি সহধর্মিণী।

১৯২৮ সালের ১৫ জুলাই অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত নোয়াখালি জেলায় প্রতিমা বসু জন্মগ্রহণ করেন। বাবা যতীন্দ্রনাথ, মা প্রফুল্লনলিনী। স্কুলজীবন থেকেই তিনি মেধাবী ছিলেন। তাঁর ছোটবেলা কেটেছে পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত দ্বীপ হাতিয়াতে।

ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত প্রাইভেটে পড়াশোনা করেন। মা-বাবা এবং দুই বড় দিদি বীণাপানি ও রীনা তাঁকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। বাড়িতে ছিল দেশভক্তির পরিবেশ। তাঁর কাকা ফণীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। ফলে দেশপ্রেমের মনোভাব তখনই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রতিমা বসু ছিলেন যথার্থ দেশপ্রেমিক। সর্বসাধারণ মানুষের জন্য দরদভরা অন্তর, দেশ ও মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ।

দুর্ভাগ্যজনক দেশভাগের পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৪৭-এ বাংলায় সাম্মানিক সহ বি এ পাশ করেন। ১৯৫২

সালে বাংলায় এম এ পাশ করে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। ১৯৬০ সালে তিনি হাওড়া রামকৃষ্ণ আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ ৩৭ বছর শিক্ষকতার কাজে ব্রতী ছিলেন। ততদিনে তিনি ইংরেজীতেও স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কালিদাস বসুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৯৪০ থেকেই শ্রীবসু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিবেদিত প্রাণ কর্মী। তাঁরই প্রেরণায় প্রতিমাদি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কাজে যুক্ত হন ১৯৬০ সালে। হিন্দুত্বের আদর্শবাদে আকৃষ্ট হন। প্রতিমাদির প্রেরণায় সমিতির কাজে ব্রতী হয়েছেন অনেক সেবিকা। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী মৌসীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে সমিতির কাজের প্রসারে ভগীরথ-ভূমিকা পালন করেন। তাঁরই প্রেরণায় স্বর্গীয়া বাসন্তী বাপট, শ্রীমতী মহুয়া ধর, শ্রীমতী কমল চক্রবর্তী ও শ্রীমতী মায়া মিত্র-রা সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্ত কার্যবাহিকা এবং পরে প্রান্ত সঞ্চালিকা হিসেবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। অনেকবার অখিল ভারতীয় বৈঠকেও বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। সমিতির সম্পর্কে বাংলায় অনেকগুলি বই তিনি সম্পাদনা ও রচনা করে গেছেন। বেশির ভাগ বই-ই সমাদৃত হয়েছে। স্বামী ভূতেশানন্দজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজেও যুক্ত ছিলেন।

তাঁর প্রয়াণে সমিতি যেমন এক নেত্রীকে হারাল, দেশও এক সত্যিকার দেশব্রতীকে হারাল। এই ক্ষতি অপূরণীয়। সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' পত্রিকা ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার সদ্‌গতি প্রার্থনা করছে।

সক্রিয় লস্কর-এ-তৈবা

(১ পাতার পর)

নেপাল থেকে আগত জনৈক সইফুল্লার। এই সইফুল্লা নামে-বেনামে নেপালে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মালিক। যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে পাকিস্তান থেকে প্রচুর কালো টাকা আসত এবং নেপালে হাতবদল হয়ে সেই টাকাই ভারতের মাটিতে সংঘটিত সন্ত্রাসে খরচ করা হত। প্রসঙ্গত, গ্রেপ্তারের সময় মাদানির কাছ থেকে পাওয়া যায় সন্ত্রাসবাদী তহবিলের জন্য ৮০০০ মার্কিন ডলার, ৫০,০০০ টাকার জাল নোট, নেপালের মূল্যে ৪০৬৭ টাকা, নেপালের নাগরিক পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি।

ভারতে সন্ত্রাস চালানোর জন্য নেপালের মাওবাদীরা মদত যোগাচ্ছিল বলে পুলিশের অনুমান। ভালোভাবে জেহাদি কাজকর্ম চালাতে মাদনি কাঠমাণ্ডুতে 'নাইস ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস্' নামে একটি কোম্পানী খুলেছিল বলে জানা গেছে। ১৯৯৫-তে নেপালের সাপতারিতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সে।

পাক-প্রেরিত জেহাদি ইসলামি সন্ত্রাস ছেয়ে ফেলেছে ভারত ও নেপালকে। ভারতের মাটিতে সংঘটিত সন্ত্রাসে আবারও মিলছে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ। জেহাদি জঙ্গি সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন গত বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বিস্ফোরণের ঘটনার পূর্বে ই-মেলের মাধ্যমে সেই সন্ত্রাসের বার্তা আগাম পাঠিয়েছিল বলে দিল্লীর পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে। দিল্লী পুলিশের দাবী, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সদস্য মনসুর আসগর ও তার দুই সহযোগী ওই ই-মেলগুলি রাজধানীর সন্ত্রাসের ঘটনার পূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিস ও নিউজ চ্যানেলে পাঠায়। দিল্লী পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরে মুম্বাই পুলিশের হাতে ধৃত পরভিন সহ ওই তিনজনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দিল্লী আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করেছে তারা। শুধু ভারতবর্ষের রাজধানীতেই নয়, গত বছরের ২৬ জুলাই আমেদাবাদে সিরিয়াল বিস্ফোরণের ঘটনার পূর্বেও মনসুর ও তার সাত সহযোগী মহারাষ্ট্রের পুণে থেকে অনুরূপ হুমকি মেল পাঠিয়েছে বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০০৮-এর ১৩ সেপ্টেম্বর রাজধানী দিল্লীতে ওই বিস্ফোরণে ২৬ জন মারা যান ও শতাধিক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন।

পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, মনসুর ইয়াহু ইনকর্পোরেশনে কর্মরত একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ই-মেল পাঠানোর চক্রান্তে তার অন্য দুই সহযোগী হল কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক মবিন ও আসিফ নামক দুই ব্যক্তি। এর মধ্যে আসিফ ওই হুমকি মেলের বিষয়বস্তুকে উর্দু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে এবং মবিন সেই অনুবাদকে কম্পিউটারে ড্রাফট হিসেবে লোড করে এবং সর্বোপরি পরভিন উই-ফি নেটওয়ার্ক হ্যাক করে সেই মেল পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবরানুযায়ী, অভিযুক্তদের নামে এর মধ্যেই আই পিসি-র (ইন্ডিয়ান পেনাল কোড) বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ ঝুলছে। বিস্ফোরক বস্তু রাখা, বেআইনি কাজকর্ম নিবারক আইন এবং তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী মনসুরের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

এক সংবাদে জানা গেছে, দিল্লীর পুলিশের পক্ষ থেকে পাওয়া ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পাকিস্তানী আমির রেজা খান সহ ১৬ জন মুজাহিদিন সদস্যের বিরুদ্ধে জামিন-অযোগ্য ধারায় চার্জশিট পেশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণে অনুপ্রবেশের উল্লেখ নেই, আদবানীর ক্ষোভ

সংবাদদাতা।। পঞ্চদশ সংসদের যুগ্ম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণে অনুপ্রবেশ সমস্যার কথা উল্লিখিত না হওয়ায় নিজের হতাশভাব গোপন করেননি লোকসভার বিরোধী দলনেতা লালকৃষ্ণ আদবানী। বিজেপির এই প্রবীণ নেতা বলেন, "অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের অসম সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অনুপ্রবেশ করার মতো একটি গুরুতর সমস্যা রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে উল্লিখিত হয়নি দেখে হতাশ হয়েছি। ভারতের অবশ্যই এ নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলা উচিত। তবে সুপ্রিম কোর্ট এ নিয়ে যা করতে বলেছিল সরকারের তাই করা উচিত।' প্রসঙ্গত, অনুপ্রবেশ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় ছিল, অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে তাদের বহিষ্কারের বন্দোবস্ত করতে হবে সরকারকে।

চীনের বিষয়ে আদাবানীর বক্তব্য, ভারতের উচিৎ সম্পর্কটা ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা। তাঁর কথায়, "এই প্রচেষ্টায় সম্মান খোয়ানোর কোনও ব্যাপার নেই। তবে এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। ভারত যেন (চীনের থেকে) কোনও কিছু প্রার্থনা না করে, এ নিয়ে সরকারের সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।"

পাকিস্তানের পরমাণু চুক্তি নিয়ে চীনের সহযোগিতার বিষয়টি উদ্বেগজনক বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

আয়লা ত্রাণে আর এস এস

(১ পাতার পর)

সোনাখালি, কুলতলি, গোসাবা, পাঠানখালি, হেমনগর ও মন্দিরঘাট এলাকায় আয়লা আসার পর মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই স্বয়ংসেবকেরা পৌঁছান এবং বহু মানুষের প্রাণ রক্ষা করেন।

জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ। প্রবাদটা এতদিন ছিল বইয়ের পাতায় আর সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহে যাওয়া মানুষজনের বাস্তব অভিজ্ঞতায়। সুন্দরবন বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখচ্ছবি। মোটামুটিভাবে সুন্দরবন বলতে আমরা বুঝি 'বায়োস্ফীয়ার রিজার্ভ ফরেস্ট 'টুকুই। যেখানে বাঘ, কুমির ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের বাস। সেখানে জন-মানবের অস্তিত্ব তো অলীক কল্পনা মাত্র। কিন্তু আসলে সুন্দরবনের সূচনা ক্যানিং থেকে। বহু মনুষ্যবসবাসকারী একাধিক দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত সেই সুন্দরবনে এবার আছড়ে পড়েছিল ঘূর্ণিঝড় আয়লা। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই ঘটা এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মওকা নিতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসক, বিরোধী কোনপক্ষই। মুহূর্তের মধ্যে 'আয়লা' পর্যবসিত হয়েছিল রাজনৈতিক ইস্যুতে, এমনকী ত্রাণ নিয়ে চলছিল চূড়ান্ত দলবাজি। যার নিট ফল, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গতদের কাছে কোনওভাবেই পৌঁছোয়নি ন্যূনতম কোনও ত্রাণ। রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসেব মেলানোতে ব্যস্ত রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন ত্রাণের ময়দানে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রীদের আগমন শুধু ত্রাণকাজকে ব্যাহতই করেনি, দুর্গত মানুষদের এক লহমায় ভোটের ময়দানে টেনে নামিয়েছিল। রাজনৈতিক নেতাদের এ নিয়ে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপকে দূরে সরিয়ে রাখলেও যে প্রশ্নটা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে তা হল প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা কি করছিলেন এই ব্যাপারে? তাঁরা যুক্তি সাজাচ্ছেন, যে কিছু-কিছু এলাকা নাকি দুর্যোগের কারণে এতই দুর্গম হয়ে পড়েছিল যে তাঁরা সেই দুর্যোগপূর্ণ স্থানে যেতেই পারেননি! এই অপদার্থ প্রশাসন সেইসব জায়গায় পৌঁছতে না পারলেও পৌঁছে গিয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা।

শুধু আর এস এসই নয়, তাদের সহযোগী বিভিন্ন সংগঠন যেমন, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি সমাজসেবা ভারতী ও অন্যান্যারাও বন্যা ত্রাণে বিপদসঙ্কুল পথে এগিয়ে যেতে দ্বিধা করেনি। বিদ্যার্থী পরিষদ রাজ্যের সর্বত্র বন্যাত্রাণের জন্য ইতিমধ্যেই বিপুল ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করেছে। ইতিমধ্যেই তা দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্মীদের এই যে আত্মত্যাগ, এই যে জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে লড়াই তা কোন কাজে আসবে না। তা কোনও চ্যানেল দেখাবে না। কারণ এগুলি 'খবর' নয়। 'খবর' হল হুটার বাজিয়ে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে চেপে মুখ্যমন্ত্রীর সুন্দরবন ভ্রমণে যাওয়া বা লঞ্চে করে সপার্ষদ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর ঘোরাফেরা। তাই বন্যাদুর্গতরা শেষপর্যন্ত উপলব্ধি করে থাকেন, তাঁদের লাশের ওপর চলে রাজনীতির বাজি। তবে দুর্গতরা মানুষ চিনেছেন। তাই তো শঙ্খধ্বনি দিয়ে গ্রামের মা-বোনেরা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন মুক্তিপথের অগ্রদূত সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের।

ত্রাণ-সামগ্রী লুঠ

(১ পাতার পর)

অন্ধকারে গ্রামে ঢুকে ডাকাতি করছে। তাদের লক্ষ্য গরু, ছাগল, ত্রাণে পাওয়া চাল-ডাল, অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র লুঠ করা। ত্রাণ নিয়ে আসা স্বয়ংসেবকদের পরামর্শ ও সহযোগিতার সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে-গ্রামে সম্প্রতি গ্রামরক্ষী দল গড়ে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও জলপুলিশের যৌথ টহলদারি অবিলম্বে শুরু না হলে বিদেশী হার্মাদদের দমন সম্ভব নয়।

সি পি এম নেতারাই কফিনে পেরেক মারছেন

নির্বাচনী আয়লাতে সি পি এম বিধবস্ত। আয়লাতে পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলা ধবংস হয়ে গেছে। বন্যা আক্রান্ত মানুষের কাছে পানীয় জলই পৌঁছাতে ৯ দিন লেগেছে। ত্রাণ পৌঁছাতে ক'দিন লাগবে কে জানে! আর ত্রাণ বিলিতে সরকারি ব্যবস্থার চাকচিক্য ভেসে গিয়ে ভেতরে খড়ের গাদা বেরিয়ে পড়েছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা

নিশাকর সোম

বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে দর্শন দিচ্ছেন। আহাঃ কি ভাগ্য বন্যার্তদের। তবে বন্যাপীড়িত জনগণ মন্ত্রীদের ও বিধায়কদের দেখে পুলকিত হয়নি। কারণ, দুর্দশার শেষ সীমানায় মৃত্যুর দরজায় এসে আজ বন্যাপীড়িতরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। তাই তো তাঁদের ন্যায্য ক্ষোভ ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক গোপাল গায়েনের ওপর। তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়ে, হাতে জুতো ধরিয়ে, কাদা মাখিয়ে দিয়ে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছে। এইভাবেই ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সি পি এম কাদায় পড়বে!

বন্যাপীড়িতরা আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে অপদার্থ বলেছেন। যথার্থই অপদার্থ — বায়ুভর্তি থলি (স্তালিনের ভাষায় উইণ্ডব্যাগ)। কেউ বলেছেন, এমন মুখ্যমন্ত্রীর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া উচিত। সত্য জনগণ! কি বিচিত্র এই সি পি এম— এদের নেই লজ্জার লেশ। লজ্জা থাকলে পদত্যাগ করতেন। লজ্জার মাথা খেয়ে মুখ্যমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী, জলসম্পদ মন্ত্রী গদীতে সেঁটে বসে আছেন।

এদিকে রেলমন্ত্রীর ত্রাণের প্রশংসা করেছেন ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রী মোর্তাজা হোসেন। করবেনই তো, কারণ ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে বিরোধী জোটের বোঝাপড়া অনেক এগিয়েছে। দলের ভাঙন রোধ করতে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা সি পি এম সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছেন।

সি পি আই বলছে, দুর্নীতির পাঁকে ডুবে অহঙ্কারের মদমত্ততায় সি পি এম নেতৃত্ব এই বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সি পি আই নেতা এ বি বর্ধনকে সি পি এমের লেজুড়বৃত্তি ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। শ্রীবর্ধন বলেছেন, ইউ পি এ থেকে সমর্থন তোলার সময়টা বাছা ঠিক হয়নি। ১৯৭১ সাল ফিরে আসছে সি পি আই-য়ে।

আর এস পি-তে মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবি তীব্র হয়েছে। যদি সি পি এম নেতৃত্বের কোনও পরিবর্তন না ঘটে, তবে আর এস পি-ও মিনি-ফ্রন্ট গড়ার উদ্যোগ নেবে। সেই ফ্রন্টে নকশাল গোষ্ঠীদেরও আহ্বান করা হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গেছে। বস্তুত, বামফ্রন্টে আজ সি পি এমের পাশে কেউই নেই। এমনকী কিরণময় নন্দ, প্রবোধ সিন্‌হা ও প্রতীম চ্যাটার্জীরাও সি পি এমের নিন্দা করেছেন। তাঁদের অবহেলার অভিযোগও উঠেছে। এরজন্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে দায়ী করা হচ্ছে।

একটা কথা চালু আছে, ভগবান যাঁকে মারেন তাঁকে পাগল করে মারেন। আর পাগল হলেই পাগলের প্রলাপ শোনা যায়। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু পুরুলিয়া জেলা কমিটির সভার পর বলে ফেলেন, 'মানি ব্যাগ' হারিয়ে দিয়েছে। কী ভয়ানক কথা! জনগণকে এমন অপমান একমাত্র ভ্রষ্টাচারীরাই করে থাকে।

সামনে জুতো হাতে সি পি এম বিধায়ক গোপাল গায়েন।

এই বিমানবাবুই আবার 'গণশক্তির' দুই কর্মীর স্মরণসভায় 'কমিউনিস্ট সুলভ' আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। ভণ্ডামির একটা সীমা আছে। পার্টিতে কিছু নেতা-কর্মী বলেছেন, বিমানদার উচিত পুরুলিয়াতে থাকা এবং কোনও একটা এন জি ও-র কর্তা হয়ে সন্তুষ্ট থাকা। এর বেশি বিমানদার যোগ্যতা নেই।

আর একজন দম্ভোক্তি করা ব্যক্তি— তিনি হলেন দুর্মুখ রায় তথা মেয়র বিকাশ রঞ্জন। তাঁর অমৃতবাণী হল 'আর একবার আয়লা হলে ভালভাবে তখন সামলাতে পারা যাবে।' তিনি পুরসভার সভাতে ঘুমে মগ্ন আছেন, ছবি উঠেছে একটি বাজারি পত্রিকায়। কলকাতার রাস্তায় এখনও গাছ পড়ে আছে। ঠিক তখনই মেয়র হাইকোর্টে সারাদিন নিজের রোজগার চালিয়ে গেছেন। এদিকে কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখার্জী বলেছেন, 'মেয়রের ঘুমন্ত ছবি টাঙিয়ে দিলেই আমাদের কাজ শেষ। কলকাতা থেকেও সি পি এম মুছে যাবে।' যথার্থ কথা। সি পি এমের কলকাতা জেলা কমিটি বিকাশবাবুকে মোটেই পছন্দ করেনি। মুখ্যমন্ত্রীর তিনি একজন সাইকো-ফ্যান। ১৯৬৯ সালে কলকাতা পুরসভায় সি পি এম পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। তারপর সেই অবস্থা কি টিকে গেছিল— কেন টেকেনি? কে দেবে এর জবাব? কলকাতা পার্টির বিভিন্ন জেলা সম্মেলনে সেন বংশের প্রশংসার বন্যা বয়ে গেছে। নিজ দোষে কনক লঙ্কা আপনি মজাইলা। সি পি এমের এই সব নেতারা ভস্মলোচন। যেদিকে তাকায় সেটাই ভস্ম হয়ে যায়।

সিপিএমের নেতৃত্বের আত্ম-সমালোচনা বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। সীতারাম ইয়েচুরি বলেই দিলেন, নেতৃত্ব বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই।

কমিউনিস্টদের আত্মসমালোচনা সম্পর্কে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা

(এরপর ৭ পাতায়)

অন্য রকম

এলগিন টকীজ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একদিকে কেবলে হরেক চ্যানেল, অন্যদিকে মাল্টি প্লেক্স। ঝাঁ-চক্‌চকে বিনোদন। এর ওপর রয়েছে বিনোদনের অত্যাধুনিক যন্ত্র। এল সি ডি টিভি থেকে ইন্টারনেটের চল। প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা সিনেমা হল। দেশজুড়ে হলগুলির দেউলিয়া অবস্থা। অন্ধকারের মুখে দাঁড়িয়ে সিনেমা হলের মালিকরা। প্রতিযোগিতার বাজারে তাদের লড়াই টিকে থাকার। আসলে কোনওমতে অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখা। তবে এতসবের মাঝেও সে আছে। হারিয়ে যায়নি অন্যান্য সিনেমা হলগুলির মতো। ব্যাঙ্গালোরের 'এলগিন টকীজ'। আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল এই সিনেমা হলটি। একেবারে ক্লাসিক।

১৮৯৬ সাল থেকে যাত্রা শুরু এলগিনের। বৃটিশ শাসন থেকে এন ডি এ, ইউ পি এ— সব শাসনেরই সাক্ষী এলগিন। ব্যাঙ্গালোরের মতো তথ্য-প্রযুক্তির নগরে এলগিন সিনেমা হল এখনও দর্শকদের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে। তাও মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে। এখনকার বাজারেও মাত্র ২০ টাকার বিনিময়ে দেখা যায় সব ধরনের সিনেমা। অন্যান্য হল যেখানে টিকিটের দাম বাড়িয়েও টিকে থাকতে পারছে না। সেখানে এলগিনের টিকিটের দাম সব থেকে কম। ব্যাঙ্গালোরের মতো শহরে টাকাটা শুধু কম নয়, খুবই কম। এলগিনের বর্তমান মালিক এন কৃষ্ণমূর্তি। তাঁর হাত ধরেই চলছে এই হল। একসময় তাঁর দাদুর হাতে ছিল এর দায়িত্ব। এখন তাঁর। তবে এখানে কোনও বিতণ্ডা নেই। নেই হলের মধ্যে কর্মী অসন্তোষ। দর্শকদের মধ্যেও কোনও ক্ষোভ নেই। তাদেরও 'সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ' হয়ে যাচ্ছে।

এলগিন সিনেমা হল।

এলগিনের আরেক বৈশিষ্ট্য ক্লাসিক ছবির প্রদর্শনী। ক্লাসিক ছবিই বেশি দেখানো হয় এই হলে। সেই পুরনো ছবি দেখারও সুযোগ পায় ক্লাসিকপ্রেমীরা। ধর্মেন্দ্র-হেমামালিনী জুটির ছবি আবার নতুন করে দেখার সুযোগ। সুযোগ হাতছাড়া করেন না অনেকেই। ২০ টাকার বিনিময়ে দেখে নেন। আঞ্চলিক ছবিও চলে অনেক।

এলগিন টকীজের দর্শকের অভাব হয় না। 'মাছি' তাড়াতে হয় না মালিককে। অনেক ছবি মাসের পর মাস চলেছে। আবার 'খেল', 'লোহা'র মতো সিনেমাও দিব্যি সপ্তাহ ধরে চলেছে। আজও চলছে। এলগিন নিজেই নিজের কাছে অন্যরকম। বৃটিশ আমলের এই সিনেমা হল বাঁচিয়ে রেখেছে হলের গৌরব। একসময় থিয়েটার থাকলেও, এখন শুধুই সিনেমা হল। এটাও কালের প্রবাহে বেঁচে থাকার জন্য। সরকারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এলগিন-র প্রতি ভালোবাসার অভাব নেই দর্শকদেরও।

ইসলামপুর পুরনির্বাচনে সি পি এম দিশাহারা

মহাবীর প্রসাদ টোডি।। লোকসভা ভোটের জন্য চাঁদা হিসাবে তোলা কোটি কোটি টাকা কোথায় গেল, এ নিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা সিপিএমে প্রশ্ন উঠেছে বলে শোনা যাচ্ছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে, সরকারি ভাবে যে হিসাব দেখানো হয়েছে বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে।

কিন্তু সেই টাকার কোনও হিসাব জেলা নেতৃত্ব দিতে পারছে না। দলের কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, ভোটে দল হেরে গেলেও জেলা নেতৃত্বের কয়েক জনের কোনও আফশোস নেই, কারণ তাঁরা এই সুযোগে প্রচুর কামিয়ে নিয়েছেন। জেলা নেতৃত্ব অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে নারাজ।

প্রকাশ যে, লোকসভা ভোটের খরচ জোগাতে এবার উত্তর দিনাজপুর জেলার সি পি এম বিভিন্ন সূত্রে কোটি কোটি টাকা চাঁদা তুলেছিল। দলীয় সূত্রেই জানা গেছে যে, শুধুমাত্র রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন ঠিকাদার সংস্থার কাছ থেকেই ৮০ লক্ষাধিক টাকা উঠেছিল। এ ছাড়াও জেলার বিভিন্ন চা-বাগান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কাছ থেকেও লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তোলা হয়। জেলাশাসকের কাছে নির্বাচনী প্রচারের জন্য মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে।

এদিকে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের আগে জেলা, জোনাল, লোকাল এবং শাখা কমিটিগুলিকে চাঁদা আদায়ের জন্য যে রসিদ ধরানো হয়, সেই চাঁদার হিসাব দলের জেলা কোষাধ্যক্ষের কাছে জমা দিতে হয়। কিন্তু এবার চাঁদা আদায়ের পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিসাব জমা পড়েনি। দলের অনেকেই বলছেন যে, কোথাও কোথাও ১০০ টাকার রসিদ দিয়ে ৫০০ টাকা, এমনকী ১০০০ টাকাও নেওয়া হয়েছে বলে খবর রয়েছে। অনেক দলীয় সদস্য যত টাকা তুলেছেন, তার পুরোটাই জমা দেননি। দল গোহারা হারার পর জেলা নেতাদের অনেকেই পার্টি অফিসে আসাই বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে হিসাব নিকাশও মাথায় উঠেছে। এই অবস্থায় দলের জেলা কমিটির অনেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে। তাঁদের অভিযোগ, অনেকেই মোটা টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। ক্ষুব্ধ কর্মীরা বলেন যে, দল হারল, না জিতল তা নিয়ে নেতাদের কোনও হেলদোল নাই। স্রেফ টাকা কামানোর জন্য অনেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে প্রার্থীর কাছের লোক হওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভোট পার হতেই তারা বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে।

এদিকে জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহল এ অভিমত প্রকাশ করে বলেছে যে, একদিকে যেমন সি পি এমের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি নেতা-কর্মীদের দল ছাড়ার হিড়িক আটকাতে সি পি এম নেতৃত্ব দিশেহারা হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গেছে যে, যে সমস্ত জেলা নেতারা দীর্ঘদিন ধরে পার্টিতে একচ্ছত্র ক্ষমতার বলে স্বেচ্ছাচারিতা, একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছিল, তাতে যে সমস্ত নেতা-কর্মীরা কোণঠাসা হয়ে উপরোক্ত নেতাদের স্বেচ্ছাচারিতা মুখ বুজে সহ্য করছিল। তাঁরাই এখন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীরূপে দলীয় গোপন তথ্যগুলি ফাঁস করে সিপিএম নেতৃত্বকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। এখন সিপিএম নেতৃত্ব ঘর বাঁচাবে না বাহির বাঁচাবে! কারণ এ জেলায় পুরসভা নির্বাচন ২৮ জুন। এদিকে দলের ভিতর ও বাহির ঠিক রাখতে সি পি এম নেতৃত্ব রীতিমতো দিশেহারা অবস্থায় পড়েছে।

গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশ

বাংলাদেশীদের সত্বর বহিষ্কার করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অসমে ২০০৪ থেকে ২০০৯---এই পাঁচ বছরের মধ্যে অস্বাভাবিক হারে ভোটার বেড়েছে। বাড়তি ভোটার হল ২৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৭৪৩ জন। এজন্য অসম এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে জবাবদিহি দাবি করেছেন বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যবেক্ষক হরেন্দ্রপ্রতাপ। গত ৩০ মে গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ১৯৯৯ থেকে ২০০৪-এর মধ্যে পাঁচবছরে অসমে ভোটার সংখ্যা বেড়েছিল সাত লক্ষ তের হাজার। তাই গত পাঁচ বছরের ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি একেবারেই স্বাভাবিক নয়। এরকম বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য ব্যাপক পরিবর্তন রাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের বলে শ্রীহরেন্দ্রপ্রতাপ মন্তব্য করেন। কেন্দ্র এবং রাজ্যকে এই বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ দেখাতে হবে বলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি জানান।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় তিন দশক ধরে অসমের বিভিন্ন ছাত্রসংস্থা, সামাজিক সংস্থা, রাজনৈতিক দল এবং গুয়াহাটি হাইকোর্ট এমনকী দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত অসম থেকে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য সরকার এতে আদৌ গা করেনি। অত্যন্ত ধীর গতিতে চলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে হরেন্দ্রপ্রতাপ, রমেন ডেকা এবং অন্যরা।

সুপ্রিম কোর্ট তো একবার বাংলাদেশীদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট হারে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছিল। তবে কোনও কোর্টের নির্দেশেই অসমে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার গা করেনি। এটা বাস্তব সত্য। সম্প্রতি ২০ মে গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতি বি. কে. শর্মার বেঞ্চ জনৈক মহম্মদ আবদুল হাসিম বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যদের এক মামলায় অসমের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবকে তলব করেন। বাংলাদেশী বলে যে ক'জন হাতে গোনা মুষ্টিমেয় চিহ্নিত হয় তাদেরকেও বহিষ্কার করা হয় না নানা অজুহাতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রতিনিধি অজয় কানোজিয়া (সহ-স্বরাষ্ট্র সচিব) এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র কমিশনার রাজীব বরা জবাবদিহি করতে আদালতে হাজির হয়েছিলেন।

রাজীব বরা জানান, তাঁদের দায়িত্ব হল বিদেশী শনাক্ত করে আইনী পদ্ধতিতে তাকে বি এস এফ-এর হাতে তুলে দেওয়া। বাকী কাজ বি এস এফ তথা কেন্দ্রের। আবার এরকম ক্ষেত্রে বি এস এফ-ও বিতাড়নের জন্য হাতে নিতে চায় না। কেননা, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী চিহ্নিত বাংলাদেশীকে ফেরৎ নিতে অস্বীকার করে। এসব সত্ত্বেও আক্ষরিক অর্থে বিতাড়ন হচ্ছে। তবে সরকার সীমান্ত বরাবর বাংলাদেশীদের আটকে রাখার জন্য কেন্দ্র তৈরি করছে।"

বিচারপতি শর্মা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি অজয় কানোজিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন্দ্র কেন বাংলদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করছে না? জবাবে কানোজিয়া জানান, অসম সরকারকে বিদেশিদের বহিষ্কারের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া আছে। বিচারপতি শর্মা কানোজিয়াকে আবারও জিজ্ঞাসা করেন, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধান না করে বছরের পর বছর ধরে ফেলে রাখা হয়েছে কেন?

প্রসঙ্গত, এই মামলার শুনানী গুয়াহাটি হাইকোর্টে গত ৯ মার্চ থেকে চলছে। জুন মাসেও শুনানী চলবে। গত বৎসর এরকম একটি মামলার রায়ে বিচারপতি শর্মা মন্তব্য করেছিলেন---'অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশীরাই অসম রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হবে।' তিনিই বের করেছিলেন বাংলাদেশী কামালুদ্দিনের 'যমুনামুখ' বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘটনা। তাঁর মন্তব্যের পর অবশ্য কামালুদ্দিনকে অসম পুলিশ করিমগঞ্জ জেলার মহিশাসন বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে বহিষ্কার করে। ততদিনে কামালুদ্দিন নওগাঁ জেলায় ঘরসংসার গুছিয়ে ফেলেছিল এদেশীয় মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করে। মেয়ের বিয়েও দিয়েছে। তার প্রজন্ম কিন্তু ভারতের নাগরিক হয়ে ভারতেই থেকে গিয়েছে।

এভাবে জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের চরিত্র বদলের মানে বাংলাদেশীদের (পড়ুন মুসলমান) অসমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাওয়া।

মেধা তালিকার শীর্ষে থেকেও বঞ্চিত রুণু মেধি, নিযুক্ত 'হুসেন'

নিজস্ব সংবাদদাতা।। মেধাতালিকায় শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও রুণু মেধিকে বঞ্চিত করে মহম্মদ নবী হুসেনকে চাকরিতে নিযুক্ত করল অসম সরকার। গত ৩১ মে গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংখ্যালঘু তোষণের তীব্র অভিযোগ জানান ভারতীয় জনতা পার্টির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠন সম্পাদক পি চন্দ্রশেখর রাও।

গতবছর একটি বিশেষ পদের (ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট) জন্য চাকরি প্রার্থীদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই লিখিত পরীক্ষায় মরিগাঁও জেলার লোথাবাড়ি নিবাসী জনৈকা রুণু মেধি (স্বামী বিমানজ্যোতি মেধি) ৬৪.৫ নম্বর পান। সেখানে অন্য প্রতিযোগী মহম্মদ নবী হুসেন পান ৫৪.৫ নম্বর। এছাড়া কম্পিউটার এবং অন্যান্য মৌখিক পরীক্ষা মিলিয়ে রুণুর প্রাপ্ত মোট নম্বর হল ৮৮.১৬; সেখানে মহম্মদ নবী হুসেনের প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বর মাত্র ৭৮।

মেধা তালিকায় রুণু সর্বপ্রথম, অথচ পাঁচ নম্বর স্থানে থাকা মহম্মদ নবী হুসেনকেই নিযুক্তি দেওয়ার জন্য সিলেকশন কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরে জানা যায়, অসমের খাদ্য ও নাগরিক পূর্তি তথা সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রীর সুপারিশেই ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে রুণু সুবিচার প্রার্থনা করেন।

বিজেপি নেতা পি চন্দ্রশেখর আরও জানান যে, এবছর ২৯ এপ্রিল মহামান্য গুয়াহাটি হাইকোর্ট এক নির্দেশে সব সুপারিশ একপাশে রেখে রুণু মেধিকে নিযুক্তি দিতে নির্দেশ দেন। গতবছর ২২ ডিসেম্বর (২০০৮) সিলেকশন কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে একমাসের (২৯ এপ্রিল থেকে) মধ্যে দশ হাজার টাকা করে জরিমানা বাবদ জমা দিতেও আদেশ দেন হাইকোর্ট। ইতিমধ্যে মাসাধিক সময় পার হলেও রুণু মেধিকে নিযুক্তি দেওয়া হয়নি, জরিমানার টাকাও জমা করা হয়নি।

শ্রী চন্দ্রশেখর আরও অভিযোগ করেছেন, "এভাবেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রাপ্ত সর্বোচ্চ অঙ্ককে অবহেলা করে মন্ত্রীর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট ২২ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে সিলেকশন কমিটির সভার মিনিট বুক পর্যবেক্ষণ করে মহম্মদ নবী হুসেনের সম্পর্কে রাজ্যের খাদ্য ও নাগরিক পূর্তি তথা সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রীর সুপারিশ প্রত্যক্ষ করেন এবং নির্লজ্জভাবে নিযুক্তির বিষয়টি অনুধাবন করে ওই রায় দেন।

শ্রী চন্দ্রশেখর বলেছেন, অসমের কংগ্রেসী রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে যেভাবে সংখ্যালঘু তোষণ করেছেন তা সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে।

রাজনৈতিক লাভালাভের কারণেই পাঞ্জাবে হিংসা

নিজস্ব সংবাদদাতা।। আটের দশকের পর, পাঞ্জাবে সব থেকে বড় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে গত ২৫ মে। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র পাঞ্জাবে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাস্থিত গুরু রবিদাস মন্দিরে আচমকা কিছু সমাজবিরোধী হামলা চালায়। দুষ্কৃতীরা রবিদাস সম্প্রদায়ের সন্ত সরবণ দাস এবং সচখন্ড বল্লার মহান সন্ত রামানন্দ ও নিরঞ্জন দাসের ওপর গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই ভারত থেকে প্রচারে যাওয়া ডেরা সচখণ্ড

ডেরা সচখণ্ড প্রধানের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে হিংসা।

প্রধান নিহত হন। এ ঘটনায় স্বামীজীর একভক্তও মারা যান। তাঁর অনুগামীরা এই ঘটনায় সমগ্র পাঞ্জাবে হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।

মূলত কট্টরবাদী মনোভাবই এই ঘটনার জন্য দায়ী। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি শান্ত হলেও, বিশেষজ্ঞদের মতে, পাঞ্জাব পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এটা এখনই ধরে নেওয়া ঠিক নয়। হিংসাত্মক ঘটনায় খালিস্তানপন্থীরা সেখানে আবার মাথাচাড়া দিতে পারে। তারা এখনও কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ধর্মীয় উন্মাদনায়। পাঞ্জাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। যাদের আচার-বিচার বিভিন্ন ধরনের। সচখন্ড ডেরার কতিপয় অনুগামী চায় রাজ্যের ধর্মীয় রীতি-নীতি তাদের দ্বারা পরিচালিত হোক।

কট্টরপন্থীদের একটি গোষ্ঠী চায় না তাদের বিপরীত গুরু রবিদাসের নামে কোনও গুরুদ্বারা হোক। ডেরার ধর্মগুরু বহুবার বিদেশে গেছেন, ধর্মের প্রচারে। যা কট্টরপন্থীদের কাছে ইতিবাচক বার্তা তুলে ধরেছে। কখনও ডেরা কখনও রাধাস্বামীকে কেন্দ্র করে কোনও-না-কোনও অশান্তি রয়েছে শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির ক্ষমতা দখল। গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটির নির্বাচনে পরমজিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা আগেই ঘোষণা করে দেন। ভিয়েনায় সন্তজীর ওপর হামলায় সমগ্র পাঞ্জাবে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পাঞ্জাবের জলন্ধরের বুটা মন্ডী, গুরু রবিদাস চক, নকোদর চক, গুরু তেগবাহাদুর নগর, ফোকাল পয়েন্ট, কালিয়া কলোনীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাতেও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতে থাকে। বিক্ষোভ খুব দ্রুত হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। শতাধিক মানুষ রাজ্যের জলন্ধর পাঠানকোট রাস্তা অবরোধ করে রাখে। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতির মোকাবিলায় সেনা নামানো হয়। বহু জায়গাতে সেনার গাড়ি ভাঙচুরের খবরও সামনে আসে। বাদ ছিল না বাস, ট্রেনসহ অন্যান্য যানবাহন। বিক্ষোভকারীরা ট্রেন অবরোধ করে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় পাঁচ জন বিক্ষোভকারী মারা যায়। খোদ পাঞ্জাব পুলিশের মহানির্দেশক কে কে অত্রী বলেন এক বক্তব্যে বলেছেন, পাঞ্জাবে প্রাচীনকাল থেকে সব সম্প্রদায়ের মানুষ সদ্ভাব বজায় রেখে বসবাস করছে। পাঞ্জাবের মুনি-ঋষিরা আমাদের সৎ ভাবনা-চিন্তারই পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। পরিষদের কার্যকর্তারা স্টেশনে-স্টেশনে গিয়ে আটকে পড়া যাত্রীদের খাদ্য-পানীয় পৌঁছে দিয়েছেন।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে মায়াবতীর দুর্নীতি ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মায়াবতী মানেই কি বিতর্ক! তাজ করিডর কাণ্ড থেকে জন্মদিন পালন---সব ক্ষেত্রেই তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের খবর সামনে এসেছে। লোকসভা ভোটের পরই, দলের খারাপ ফলের জন্য কিছু আমলাকে বরখাস্ত করেন তিনি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের এক রায় সামনে এসেছে। ওই রায়ে মায়াবতীর দুর্নীতির বড় চক্র ফাঁস হয়ে গেছে। ২০০৭ সালে মায়াবতী ক্ষমতায় এসেই পিএসি (প্রভিন্সিয়াল আমর্ড কন্সটেবলারী) পদে নিয়োগ বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়, ১৮ হাজার ৮০০ পিএসি কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্তও করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কল্যাণ সিং-এর আমলেই রাজ্যে বেশ কয়েক হাজার পিএসি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এরপরে লক্ষ্ণৌ-র মসনদে আসে মুলায়মের সরকার। মুলায়ম সিং এবিষয়ে খুব একটা মাথা না ঘামালেও, মায়াবতী মসনদে এসেই পিএসি কর্মীদের ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ তোলেন। ওই অভিযোগের ওপর ভর করেই, এই বিশাল সংখ্যক কর্মীদের চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দেন। অনেকের মতে, তিনি দলীয় সূত্রে জানতে পারেন পিএসি পদের অনেকেই বিরোধী শিবিরের। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই মায়াবতী একাজ করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। বসপা নেত্রী অবশ্য এখানেই থেমে থাকেননি। এলাহাবাদ আদালতে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে হাইকোর্ট বহিষ্কারের আদেশকে অন্যায় ঘোষণা করলেও, মায়াবতী তা রোধ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সুপ্রিম কোর্ট সমিতির রিপোর্ট পরীক্ষা করে বরখাস্ত হওয়া পিএসি'দের আবার নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সরকারের সর্বস্তরের দুর্নীতির চিত্রও সামনে এসেছে। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের জমা দেওয়া রিপোর্টে পক্ষপাতিত্বেরও যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। এস কে মিশ্র নেতৃত্বাধীন সমিতি আদালতে যে রিপোর্ট পেশ করেছে, তাতেও বহু ত্রুটি ধরা পড়ে। পিএসসি কর্মীদের মধ্যে ঘুষের তদন্তের জন্য সরকার এস কে মিশ্রর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটিই সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে, সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, কমিটি রিপোর্ট দাখিলের আগেই ১৮ হাজার ৮০০ পি এ সি-কে বরখাস্ত করেন মায়াবতী। এখানেই শেষ নয়, সরকারের কাছে যে ৫১টি রিপোর্ট জমা পড়েছে, তার মধ্যে মাত্র দু'টিতেই এস কে মিশ্রর স্বাক্ষর রয়েছে। বাকি ফাইলগুলিতে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুলখান সিংহ-র স্বাক্ষর রয়েছে, যা আইন বিরুদ্ধ। শ্রীসিংহ কমিটির কোনও মেম্বার নন। অথচ

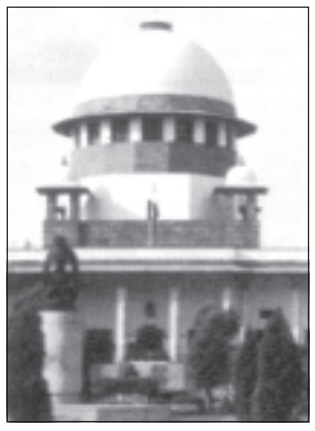

তিনি স্বাক্ষর করেছেন। এই সবই সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সামনে এসেছেন। মায়াবতী সরকার তদন্ত রিপোর্ট আসার আগেই পিএসসি-কর্মীদের বরখাস্ত করে দেন। সুপ্রিম কোর্টও এই ঘটনায় রীতিমতো তাজ্জব। আদালতের মতে সরকার থেকে প্রশাসন সবস্তরেই স্বার্থ চরিতার্থ করার এক গোপন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া সরকার ঘুষ তথা অন্যান্য অভিযোগ তুলে বহিষ্কার করলেও, আদালতে মায়াবতী সরকার তার পিছনে কোনও গ্রহণযোগ্য যুক্তি খাড়া করতে পারেনি। এমনকী, তেমন কোনও তথ্যও না। ফলে সর্বোচ্চ আদালত বহিষ্কারের আদেশ খারিজ করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মায়াবতী সরকারকে পিএসিদের পুনর্বহালের আদেশও দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মায়াবতী পিএসসি কর্মীদের বিরূপ পিছনে যে অভিযোগ তুলেছিল, তা তার দলীয় কর্মীদের অভিযোগের ভিত্তিতে। প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনও অভিযোগই ছিল না। এর ফলে সরকারের ওপর প্রশাসনের ভরসা প্রশাসনের কর্মীদের মনোবল ভাঙতে পারে।

কফিনে পেরেক মারছেন

(৫ পাতার পর)

ভবানী সেন বলেছিলেন, 'কমিউনিস্টদের আত্মসমালোচনা হল ঠাকুরমশায়ের ঘি খাওয়ার মতো। নিজের হলে একফোঁটা, অপরের হলে একপোয়া। তিনি উপহাস করে বলেছিলেন, আমরা আত্মসমালোচনার শুরুতেই বলি— নাউ আই ওয়ান্ট টু সেল্ফ-ফ্রিসাইজ ইউ। এখন আমি আপনাদের আত্মসমালোচনা করছি।

সি পি এমের কোনও নেতার কিছুই করবে না পার্টি। কারণ বৃন্দাবনে সবাই সতী। সকলেই দুর্নীতি স্বজনপোষণ বিষয়বৈভবে ডুবে আছেন। যে কমরেডগণ ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরতেন, আজ তাঁদের বাড়ি, দু'চাকা আছে। নেতাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। দু-চাকা, চারচাকা, আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক মঙ্গল সবই হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের পাল— কে কার গায়ে হাত দেবে?

পার্টিতে নেতাদের মধ্যে পরস্পর পিঠ চুলকানি সমিতি তৈরি আছে। তা নাহলে কলকাতার কোনও এক লোকাল কমিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগের অনুসন্ধান সিদ্ধান্ত নিতে তিন বছর সময় লেগে গেল! বলেছেন, অলোকবাবুর ঘনিষ্ঠ একজন। আসলে সি পি এম নেতাদের অবস্থা হল— 'শিরে হইল সর্পাঘাত, তাগা বাঁধবি কোথা?' মাছের পচন মাথা থেকেই হয়। অবশ্যই এইরকম হলে যেটা হবার সম্ভাবনাই প্রবল— তা হল পার্টির মধ্যে যে সামান্য অংশের আদর্শনিষ্ঠ কর্মী আছেন, তাঁরা চলে যাবেন। আর ম্যাসলম্যানরা তো ইতিমধ্যেই উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। নিজেদের সততা প্রমাণের জন্য সি পি এমকে মেরে নিজেদের আসল সি পি এম বিরোধী হিসাবে প্রমাণ করে দেবে।

এদিকে পার্টির মধ্যে কিছু কর্মী 'শুদ্ধি করণ কমিটি' গঠন করে গোটা রাজ্যে কাজ করতে চাইছেন। তাঁদের বক্তব্য হল— 'বিমান-বুদ্ধ-নিরুপম-বিনয়-শ্যামল তাড়াও, সি পি এম বাঁচাও।' এঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ব্রাঞ্চ পর্যন্ত প্লেনাম করতে হবে। যেমন জরুরি অবস্থার পর সালকিয়ায় প্লেনাম সুন্দরাইয়ার নেতৃত্বের ও নীতির অবসান হয়েছিল। অবশ্য সুন্দরাইয়া নিজেই সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তখন কো-অর্ডিনেটর-এর কাজ করেছিলেন জ্যোতি বসু। পরে প্লেনাম-এ সাধারণ সম্পাদক হন ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ।

পি সি এম পার্টির নীচের তলায় বলা হচ্ছে— মাও যে দং বলেছিলেন, 'পার্টির সদর দপ্তরে কামান দাগো, কারণ সেখানেই প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাঁটি।' রুশ বিপ্লবের পর জানা যায়, সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রাইকভ, টমেস্কি প্রভৃতি সোনা চালানকারী শত্রুপক্ষের চর ছিলেন। তাই মাও যে দং বলেন, 'বিদ্রোহ করাটাই সঠিক।'

পার্টির মধ্যে আওয়াজ উঠেছে ডঃ এম কে পান্ধেকে সাধারণ সম্পাদক করা হোক। রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর খোলনলচে বদল করা হোক। মন্ত্রিসভা থেকে বুদ্ধ বাবু, সূর্যবাবু, অশোক ভট্টাচার্য, কান্তি গাঙ্গুলীকে অবিলম্বে সরাও। সাতমণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। কারণ বদমাইসদের কে আর গায়ে হাত দেয়। অতএব আরও সর্বনাশ এগিয়ে আসছে সি পি এমর। তাঁদের নেতারাই কফিনে একটি একটি করে পেরেক পুঁতে দিচ্ছেন।

এখনও কি ঘুম ভাঙবে না ?

(৩ পাতার পর)

এই আত্মহত্যায় উদ্যত নরপশুরা নিশ্চয়ই পিছিয়ে আসবে।

আর যদি তাঁরা সেই ফতোয়া দিতে সম্মত না হন? তা হলে সম্মুখযুদ্ধে যেতে হবে। আর যদি তাতেও রাজি না হই, তাহলে উগ্রপন্থীর গুলিতে মরতে হবে।

চতুর্থ প্রশ্ন। সরকার তা করছে না বা করতে পারছে না, কারণ স্বাধীনতার সময় থেকে প্রধানত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর এবং তাঁর অনুসারী পণ্ডিতকুলের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ফলে আমরা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বা 'সেকুলারবাদ'-এর এক অপব্যাখ্যায় অভ্যস্ত হয়েছি। এই অপব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে মুসলিম ভোট কব্জা করার জন্য। এ কথা সবাই জানেন যে মুসলিমরা মসজিদে বসে অন্যান্য ধর্মীয় আলোচনার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনাও করেন এবং সবাই একজোট হয়ে ভোট দেন। সেজন্য মুসলিম ভোট আমাদের দেশের একশ্রেণীর রাজনীতিকের কাছে বড় প্রিয়, এর জন্য এঁরা ইমামের পদলেহন পর্যন্ত করতে পারেন। যাঁরা ইসলামবিশ্বাসী তাঁরা রোজা রাখবেন এবং পাঁচ বক্ত নামাজ আদায় করবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখা যায় জনৈকা ব্রাহ্মণকন্যা (যিনি দিনের বেলায় উপবাস করেননি) তিনি দাঁতে ছোলা চিবিয়ে রোজা রাখছেন এবং দু'হাত খুলে নামাজ পড়ার ভঙ্গি করছেন, তখন গীতার উপদেশ মনে পড়ে---"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ / স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ"।

যাঁরা মুসলিম ভোটের জন্য এই স্তরে নামতে পারেন তাঁরা কী করে ইমামদের ওপর জোর খাটাবেন? উল্টে ইমামরাই তাদের ওপর জোর খাটাবে!

এই অপব্যাখ্যার আর এক কুফল, মুসলিমদের সমস্ত দোষ চেপে যাওয়া, চূণকাম করার চেষ্টা করা। যেমন অত্যাচার করে মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়েছে এই কথা চেপে যাওয়ার জন্য বলা হয়, হিন্দু সমাজে 'নীচু জাত'-এর মানুষের ওপর 'উঁচু জাতের' মানুষ অকথ্য অত্যাচার করত, তাই তারা ইসলামের সমদর্শিতা দেখে তাতে দীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে দেশে কেন এখনও এত তথাকথিত 'নীচু জাত'-এর মানুষ, যাঁদের আজ 'দলিত' বলা হয়? এইসব নেহরুপন্থী পণ্ডিতরা এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারেন না। বিলেতে বসবাসকারী (অতএব মহাবিজ্ঞ) তপন রায়চৌধুরী নামক এক 'পণ্ডিত' এক গল্প ফেঁদেছেন, ইসলামী উগ্রপন্থার উদ্ভব নাকি ১৯৯২ সালের অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধ (যাকে বাবরি মসজিদ বলা হয়) তারই থেকে!

অথচ এই পণ্ডিতপ্রবর যে নিজের চৌদ্দপুরুষের বাসভূমি বরিশাল থেকে ইসলামী উগ্রপন্থীর প্রবল পদাঘাতে বিতাড়িত হয়েছেন তার জন্যে তাঁর কোনও খেদ নেই, সেকথা বিলকুল চেপে গেছেন। তেমনি জয়া চ্যাটার্জি, আর এক মহিলা 'পণ্ডিত' (ইনি কেমব্রিজ শিক্ষিত), প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গা আসলে মাড়োয়ারি বণিকদের পরিকল্পিত। যেখানে জিন্না স্বয়ং 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম) ঘোষণা করেছিল, কলকাতার মেয়র উসমান যেখানে হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে 'কাফের হত্যার' উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল, সোহরাওয়ার্দি যেখানে প্রকাশ্য ময়দানে দাঁড়িয়ে পুলিশ ও মিলিটারিকে অচল করে রাখার আশ্বাস দিয়েছিল, সেখানে পণ্ডিতানী কেন এবং কেমন করে এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা তিনিই জানেন। অনেকেই সন্দেহ করেন যে এই সমস্ত পাণ্ডিত্য জাহিরের মধ্যে সৌদি আরবের টাকার খেলা আছে, যা বাংলাদেশ মারফৎ ভারতে আসে এবং 'সেকুলার' পণ্ডিতদের মধ্যে বিতরিত হয়।

শেষ প্রশ্নের উত্তর ঃ পরিণতি কী? পরিণতি, এক কথায় ভয়াবহ। উত্তর-পূর্ব ভারত বাকি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সেখান থেকে সমস্ত হিন্দু বিতাড়িত হবে। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে চার লক্ষ হিন্দু এর মধ্যেই বিতাড়িত। বাকি ভারতে গৃহযুদ্ধ লাগবে। তখনও যদি সরকার (কেন্দ্র ও রাজ্য) এই মুসলিম তোষণের রাজনীতি চালাতে থাকে তা হলে ভারত টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। এর মধ্যে অন্যতম বিপজ্জনক অবস্থা হবে বাঙালি হিন্দুর।

ভুল বুঝবেন না। বারো-তেরো কোটি মুসলমান আমাদের দেশের সম্মানিত নাগরিক, তাদের ছাড়া ভারতকে ভাবা যায় না। কিন্তু তাদের জোটবদ্ধ ভোটের লোভে যদি রাষ্ট্র নিজের সুরক্ষার ব্যাপারে বুঝেশুনে খঞ্জ হয়ে পড়ে থাকে তাহলে আমাদের শত্রু

প্রতিবেশী দেশ তার সুবিধা নেবেই। একে এমনিতে ভারতের ওপর জাতক্রোধ। তার ওপরে আমরা পূর্ব পাকিস্তান আলাদা করে বাংলাদেশ হতে সহায়তা করেছি, এর বদলা পাকিস্তান, বিশেষ করে তার সেনাবাহিনী নিতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু আমাদের দেশের মুসলমানরা তো বেশিরভাগ নিশ্চয়ই তাদের সমর্থন করেন না! তাহলে তাঁরাই বা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন না কেন? সোচ্চার হিন্দু-মুসলিম নির্বিচারে সকলকেই হতে হবে। সরকারকে জেগে উঠে উগ্রপন্থা-বিরোধী আইন (যেমন পোটা, গুজকোকা বলবৎ করতে হবে---- যেমন বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করেছে) সব সম্প্রদায়ের দোষগুণ সমান চোখে দেখতে হবে। নেহরুবাদের ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে হবে। না হলে সর্বনাশ অবধারিত।

এই লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে বিজেপির পরাজয়ের পরে এইসব কথা বলা দূরে থাক, ভাবতেও অনেকে ইতস্তত করবেন। কিন্তু ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনই কি পরম মোক্ষপ্রাপ্তি? এর পরেও আমাদের বাঁচতে হবে। আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, প্রপৌত্র-প্রপৌত্রীদের বাঁচতে হবে। অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। এর পরেও যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে মাথা উঁচু করে, হিন্দু হিসেবে বাঁচার আশা আমরা ভুলে যেতে পারি।

লালমণিরহাট থেকে কেন এলাম ?

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কি? আমার জানা নেই। তবে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য একটি বিষয় হল, সে সমস্ত বাঙালি দেশভাগের সময় এবং পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত, নিপীড়িত হয়ে নিজেদের সাতপুরুষের ভিটে-মাটি জমিজিরাত, পুকুর, ফলের বাগান ফেলে রেখে তো বটেই, এমনকী মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতিতা, অপহৃতা স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীদের উদ্ধারের চেষ্টা না করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন, যে পশ্চিমবঙ্গকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অক্লান্ত পরিশ্রমে পাকিস্তানের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন; তারপর তারা সব কিছু বিস্মৃত হয়ে বামপন্থীদের দলে ভিড়ে মিছিলে মিটিং-এ স্লোগান দিতে শুরু করলেন---হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, বিভেদ নয় ঐক্য চাই, বাংলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে? গান ধরলেন---একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। এই সমস্ত বাঙালিদের মানসিকতা, একে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা যেতেই পারে। এরা নিজেরা সব কিছু বিস্মৃত হলেন। নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরও কিছু জানতে দিলেন না কেন তাদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। ফলে পরবর্তী প্রজন্ম কিছুই জানল না।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ক্লাস এইট-এ পড়তাম। বয়স ১১ কী ১২ বছর। থাকতাম রংপুর জেলার লালমণিরহাটে। আমার বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে, ইন্সপেক্টর অফ স্কুল। হঠাৎ শুনলাম বাবাকে কলকাতায় বদলি করা হয়েছে। ফলে ২।১ মাসের মধ্যেই আমাদের সবাইকে চলে আসতে হয়েছিল। চলে এসে উঠেছিলাম নবদ্বীপে মামার বাড়িতে। রংপুর জেলার এক গ্রামে আমাদের জমিদারী না থাকলেও বসতবাড়ি ছিল। ফলের বাগান, কিছু কৃষিজমি ছিল। আমরা কেন সেগুলি ফেলে এলাম। সেগুলির কী গতি হল, বাবা আমাদের কোনদিনও জানাননি। তখন বাবাকে ভীষণ ভয় পেতাম। নবদ্বীপে বছরখানেক থাকার পর পার্ক সার্কাসের বেকবাগানের কাছে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া যেতে আমরা কলকাতায় চলে এলাম। ১৯৫০ সালের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ সামসুল হুদা রোডের দিক থেকে খুব চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ আসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে ধ্বনি "আল্লা হু আকবর"। আমাদের পাড়া থেকেও কিছু "বন্দেমাতরম" ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। আমার আর আমার ভাই-এর রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। নবদ্বীপে থাকাকালীন সঙ্ঘের শাখায় যেতাম। যেখানে লাঠি খেলা, ছুরি খেলা শেখানো হত। আমি আর ভাই তো ছুটে বেরতে গেলাম। হঠাৎ বাবার এক ধমক "এ্যাই কোথায় যাচ্ছিস? দরজা বন্ধ কর, জানলা বন্ধ কর, চুপ করে বসে থাক।" বাবাকে ভীষণ ভয় করতাম। তাই সেদিন জিগ্যেস করতে পারিনি "দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকলেই যদি নিরাপদে থাকা যেত, তাহলে লালমণিরহাট থেকে আমরা চলে এলাম কেন?" সে সময় আমাদের মামা বাড়িতেই ছিলেন। মামা ছিলেন ফিজিক্যাল ইন্সপেক্টর। যৌবনে ছিলেন বডি বিল্ডার। মামা একটু কাজে ছিলেন। ভেবেছিলাম, মামা এলেই মামার সঙ্গে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। মামা এসেই চেঁচাতে শুরু করলেন, 'কোলাপসিবল গেটটা বন্ধ করেছিস? তালা লাগিয়েছিস? হা হতোস্মি!' আমি আর ভাই নির্বাক। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

ওদিকে মুসলমানদের "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর হিন্দুদের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছিল। সবাই যদি নিজেদের ছেলেদের ঘরে আটকে রেখে দেয় তাহলে চেঁচাবে কারা? অনুমান করা যেতেই পারে সেদিন সামসুল হুদা রোডে ৬ থেকে ৬০ বছরের প্রতিটি মুসলমান রাস্তায় একজোট হয়েছিল। পরে অবশ্য পুলিশি তৎপরতায় ব্যাপারটা আর বেশিদূর এগোয়নি। "অন্যের ছেলে লড়াই করুক, তুমি ঘরে বসে থাক।" হিন্দুদের এই মানসিকতাই হিন্দুর দুর্দশার মূল কারণ। এর সঙ্গে রয়েছে ঠাকুর। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরই যদি সব করে দেবেন তাহলে ঠাকুর আমাদের শক্তি দিয়েছেন কেন? বুদ্ধি দিয়েছেন কেন? হাত, পা, চোখ, শরীর দিয়েছেন কেন? আমাদেরও যে কিছু করার আছে সেসব নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা নেই।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে যেসব ছিন্নমূল পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন তাদের অধিকাংশেরই আশ্রয় হয়েছিল বিভিন্ন ত্রাণ শিবির। সরকারি সহযোগিতায় ফুলিয়া, ধুবুলিয়া, কুপার্স ক্যাম্প এবং আরও অনেক ত্রাণ শিবির গড়ে উঠেছিল। পরে অবশ্য অনেকেই আত্মীয়-স্বজনের কাছে বা অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অধ্যাপনা, শিক্ষকতা, ওকালতি, ডাক্তারীতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেকে হয়েছিলেন সাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্র পরিচালক, শিল্পী বা রাজনীতিক। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ঘটনা তাঁদের সাহিত্যে, নাটকে স্থান পেয়েছে। এমনকী যাত্রা পালাতেও স্ট্যালিন, লেনিন প্রভৃতি মহানায়কদের নিয়ে পালা তৈরি হয়েছিল। ভিয়েতনাম, কিউবা, কঙ্গো , বসনিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেও কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছিল। কিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। উদ্বাস্তু জীবনের দুঃখ, কষ্ট, রোগ, ব্যাধিসহ নানা সমস্যা নিয়ে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় কেন এবং কি পরিস্থিতিতে পূর্ব-পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের মান-সম্মান বিসর্জন দিয়ে, ভূ-সম্পদ এমনকী স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের লুণ্ঠিত হতে দিয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনও কিছু লেখা হল না। লেখা হল না, জানতে দেওয়া হল না কী বীভৎসভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত হতে হয়েছিল ওই সমস্ত বাস্তুহারা পরিবারকে। ওই সমস্ত বাস্তুহারা পরিবারের অনেকে পরবর্তীকালে যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাদের অনেকে আবার পরে বরিশাল, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, মৈমনসিং প্রভৃতি জেলায় নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি পরিদর্শনে যান এবং ফিরে এসে বাংলাদেশীদের আদর যত্ন এবং আপ্যায়নের প্রশংসায় আপ্লুত হন। বিভিন্ন পত্রিকায় সে সমস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিতও হয়। এমনই একজন অধ্যাপক যিনি বরিশালে নিজের পৈত্রিক ভিটে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন আর ফিরে এসে বাংলাদেশীদের প্রশংসায় গদগদ হয়েছিলেন, তাকে বলেছিলাম ওই সমস্ত বাংলাদেশী যারা আপনাদের 'দেখভাল' করছিল তাদের বললেন না কেন যে ওই সমস্ত জমিজিরেত আপনারা তো বিক্রি করে যাননি, কাউকে দানও করেননি। আপনারা ওখানেই নিজেদের পৈত্রিক ভিটেতেই বসবাস করতে চান। তার ব্যবস্থা করে দিন। তা হলেই তাদের ভালোমানুষী মুখোশটা খসে পড়ত আর আসল মুখটা দেখতে পেতেন। বলাবাহুল্য অধ্যাপক মহোদয় আমার কথার জবাব দেওয়াটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে কোনও উত্তর দেননি।

দেশভাগের ৬০/৬২ বছর পরেও পূর্বোক্ত এাণ শিবিরগুলিতে এবং অন্যত্রও পুরুষানুক্রমে বাস করে চলেছেন দেশভাগের বলি ওই সমস্ত ছিন্নমূল পরিবারের লোকজন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। এঁদের কিছু, কিছু গ্রাসাচ্ছদনের জন্য তাঁত শিল্পকে বেছে নিলেও, সীমান্তবর্তী এলাকায় তাঁবেদারি বা গোলামি করছে তাদেরই, যাদের অত্যাচারে তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে বাস্তুহারা হতে হয়েছিল। ছিন্নমূল হতে হয়েছিল। এরা এখন অন্ধকার জগতের বাসিন্দা হয়ে মনিবের নির্দেশে দেশবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে। বাইবেলের ভাষায় বলতে হয় 'ইহারা জানে না ইহারা কি করিতেছে।' বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মুসলমানরা জালনোট এবং মাদকদ্রব্যের কারবার করছে, গবাদিপশু বাংলাদেশে পাচার করছে, নারী পাচার করছে আর এদের এইসব কাজে সাহায্য করছে হিন্দুরা যাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম মুসলমানদের অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কোনও রাজনীতিক এসব বিষয়ে মুখ খোলেন না। কারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানেই সাম্প্রদায়িকতা, সে সমাজবিরোধী

(এরপর ৯ পাতায়)

পথ দুর্ঘটনায় শীর্ষে ভারত
প্রতি বছর আহতের সংখ্যা দশ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একটা পরিসংখ্যান শুনবেন? আঁতকে উঠবেন না তো? আঁতকে ওঠার মতো হলেও পরিসংখ্যানটা বলেই ফেলি। শুধুমাত্র ২০০৬ সালে ভারতে পথ দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭৪৯ জন। ভারতের তুলনায় এ-ব্যাপারে বেশ খানিকটা পেছিয়ে থেকে distance second হয়েছে চীন। সেখানে ওই বছরে পথ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৮৯,৪৫৫ জন। গত বছর জুন মাসে বিবিসি-র সাংবাদিক ক্রিস মরিস এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, "বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের তুলনায় ভারতে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা বেশি। এ-বিষয়ে গঠিত একটি সরকারি কমিটির মতানুযায়ী, এটি একটি মনুষ্য সৃষ্ট মহামারী---যা ভারতের GDP (Gross Domestic Product) রেটকে এক লহমায় ৩ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বহু মৃত্যু সংগঠিত হচ্ছে এ জন্য। একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৭০ শতাংশ পরিবার যারা কোনও পথ দুর্ঘটনায় তাদের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তিকে হারিয়েছে, একই সঙ্গে সেই পরিবারগুলি দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গিয়েছে।"

পথ দুর্ঘটনার অন্তিম পরিণতি কেবলমাত্র মৃত্যুতেই থেমে থাকে না। জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার নারকীয় যন্ত্রণাভোগও জোটে কারুর-কারুর অদৃষ্টে। পথ দুর্ঘটনার সময় যাঁরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরলেন তাঁরা হয়তো চিরতরে পঙ্গু বা অক্ষম হয়ে যান কোনও কোনও ক্ষেত্রে। এ-বিষয়ে Indian Journal of Neurotrauma (2006; Volume 3; No.1, pagee 1-3)-এ V. S. Madan-এর লেখা "Road Traffic Accidents : Emerging Epidemic" নামাঙ্কিত প্রবন্ধটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ওই প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে ভারতে পথ দুর্ঘটনায় প্রতি বছরে গড়ে ১০ লক্ষ ২৭ হাজার মানুষ গুরুতরভাবে আহত হন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই বাকি জীবনটা বিছানাতে শুয়ে বা হুইলচেয়ারে বসিয়ে কাটিয়ে দেন। কারণ দুর্ঘটনায় এঁদের মস্তিক এবং স্পাইনাল কর্ড বিপজ্জনকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পাক্ষিক Front Line-এ Road to Disaster নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক ভাস্কর ঘোষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, এই ব্যাপক দুর্ঘটনাজনিত হত্যা রুখতে আদৌ কোনও পয়সা খরচ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়ে।

ভারতের বিভিন্ন জাতীয় সড়ক ও অন্যান্য এক্সপ্রেসওয়েগুলি আগাগোড়া পরিকল্পনাহীনভাবে এবং পথচারীদের স্বাচ্ছন্দ্যকে গুরুত্ব না দিয়েই নির্মিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। দিল্লী ও গুরগাঁও-এর মাঝে যে ঘিঞ্জি এক্সপ্রেসওয়েটি রয়েছে সেখানে পথচারীদের রাস্তা পারাপার করার জন্য কোনও উপযুক্ত ক্রসিং নেই। চেন্নাই থেকে মামাল্লাপুরমের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী ইস্ট- কোস্ট রোডে না আছে কোনও ওভারব্রীজ, না আছে কোনও সাবওয়ে। অগত্যা গাড়িগুলিকে এড়িয়ে কোনওক্রমে দৌড়ে রাস্তা পারাপার করতে হচ্ছে। আসলে এই ক্ষেত্রে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনাতেই গলদ রয়েছে। জাতীয় সড়ক বা এক্সপ্রেসওয়ে মানেই আমরা বুঝি সাঁই-সাঁই করে গাড়ি বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তা না করে গাড়িগুলি যদি আস্তে চালনা করা হয় এবং পথচারীদের গতিবিধি দেখে চালনা করা হয় তবে এধরনের দুর্ঘটনা অনেকাংশে এড়ানো যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তবে ন্যাশনাল হাইওয়ে বা অন্যান্য এক্সপ্রেসওয়েগুলির পথ-নকশা খোলনলচে বদলে ফেলা দরকার। দরকার রাস্তা পারাপার করার জন্য পর্যাপ্ত ওভারব্রীজ ও সাবওয়ে।

এতো গেল দূরপাল্লার রাস্তার কথা। তবে শহরের মধ্যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। সেখানে জেব্রা ক্রসিং থেকেও না থাকার মতোই অবস্থা! কোনও রাস্তা চওড়া করা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে ভারতের শহরগুলিতে রাস্তাঘাটের উন্নয়নে সঠিক কোনও দিশাই নেই। অধিকাংশ শহরের বেশিরভাগ জায়গায় ফুটপাত নেই। যেগুলি আছে, সেগুলির অবস্থাও তথৈবচ। কয়েকটা জায়গা বাদ দিলে অধিকাংশ শহরে কোনও ওভারব্রীজ বা সাবওয়ে নেই। ফুটপাতগুলিকে পর্যাপ্তভাবে চওড়া করা হয়নি। তার ওপরে হকার ও দোকানপাটগুলি জুড়ে রেখেছে ফুটপাত। সেখান দিয়ে তো পথচারীদের হাঁটাই দায়। এর পরে যদি তাতে দু'চাকার যানবাহন, এমনকী গাড়ি পার্কিং করা হয়, তবে তো নিমেষে রাস্তাঘাট নরকগুলজার! এসবের প্রতিকারের জন্য ভাবা হয়েছিল যে দিল্লীতে পথচারীদের জন্য নির্মিত ফুটপাতের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাতেও আগাগোড়া গলদ রয়েছে। যাঁরা বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী, এধরনের ফুটপাত নির্মিত হলে তাঁরা যথেষ্ট অসুবিধের মধ্যে পড়বেন। আসলে ভারতে যাঁরা রাস্তা তৈরির কারিগর ছিলেন তাঁরা মায়োপিয়া (দৃষ্টিক্ষীণতা) এবং তার দরুণ অভিন্নতার (indifference) এক বিচিত্র মিশেল তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতেই ঘটে চলেছে একের পর এক পথ দুর্ঘটনা।

আরও একধরনের পথ দুর্ঘটনার কথা বলে নেওয়া যাক। গত বছর মুম্বাই-এ ২৬/১১-এর ঘটনার স্মৃতি এখনও দেশবাসীকে আতঙ্কিত করে। নিত্যনতুন যে যে ধরনের সন্ত্রাস ঘটে চলেছে তা দেশবাসীকে পথে বেরোতে যে খুব একটা ভরসা যোগাচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য। একথা অনস্বীকার্য যে, সন্ত্রাসের বলি হন পথে-ঘাটে বেরনো সাতে-পাঁচে না থাকা অসংখ্য নিরীহ মানুষজন।

সচেতনতার অভাব। নিয়ম না মেনে এভাবেই চলছে রাস্তা পারাপার।

সম্প্রতি এ রাজ্যের ভি. আই. পি. রোডের ওপর কেষ্টপুর খালে বাস উল্টে ২১ জন যাত্রীর মৃত্যুর টাটকা ক্ষত এখনও কলকাতাবাসীর মনে। কিন্তু তার পরেও পথ উন্নয়নের কোনও ন্যূনতম রেশও প্রতিফলিত হয়নি সেখানে। কেষ্টপুর, বাগুইআটি অঞ্চলে ওভারব্রীজের দাবী ওখানকার মানুষজনের দীর্ঘদিনের। অথচ ভি. আই. পি রোডের ওপরেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে ওভারব্রীজ রয়েছে মানুষজনের ভীড় না থাকা গোলাঘাটা অঞ্চলে। এটি একটি ছোট্ট নমুনা। এরকম অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্য জুড়ে। তাই এ রাজ্যেও পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আর তার প্রতিকারের জন্য কোনও উন্নয়নের পরিকল্পনা? —এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই। রাজ্যবাসীর অবস্থা এখন যা পাই তা ভুল করে পাই, যা চাই তা পাই না।

কেন্দ্র বা ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি এধরনের দুর্ঘটনা রুখতে এ পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই কেন গ্রহণ করেননি তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। ক্রিস মরিসের বিবিসিতে ভাষণ দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। মরিসের একটি শ্লেষ দিয়েই এ লেখা শেষ করব। তিনি বলেছেন, "এটা (পথ দুর্ঘটনা) যন্ত্রণাদায়ক। যেটা মনুষ্যজীবনের তিনটি মারণরোগ, যেমন ট্রচড্ডত্র (অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম), বচ (টিউবার কুলেসিস) এবং ম্যালেরিয়ার যদি সমষ্টিগত যন্ত্রণার হিসেব করা হয় তবে যন্ত্রণাদানের ক্ষেত্রে দেখা যাবে পথ দুর্ঘটনা তার থেকেও বেশি অপরাধে অপরাধী।"

লালমণির হাট থেকে

(৮ পাতার পর)

হোক বা সন্ত্রাসবাদী। তাই আফজল গুরুর ফাঁসির দন্ডাদেশ কার্যকরী করানো না হলেও কোনও রাজনীতিকই মুখ খোলেন না। মামলা এমনভাবে সাজানো হয় যাতে সন্ত্রাসবাদীরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। কট্টর মৌলবাদী কোয়াম্বাটুর বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত মৌলানা মাদানীকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে কিছু উর্দুভাষী মৌলানা মৌলভীর নির্দেশে ভারত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। ওইসব মৌলানা-মৌলভীদের অনেকেই আবার সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তারাই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের রাজনীতিকরা এদের পদবন্দনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সুশীল সমাজ সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন কিন্তু তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের প্রশ্নে লজ্জাজনকভাবে নীরব থাকেন। যাই ঘটুক না কেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা চলবে না। তাতে নাকি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় থাকবে না।

নতুন ভোর

অবশেষে যেটা প্রত্যাশিত ছিল, সেইটাই বাস্তবে পরিণত হল। তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জোটের সুনামিতে উড়ে গেল বামফ্রন্টের দীর্ঘ ৩২ বছরের অটুট দুর্গ।

বাম সরকারের দীর্ঘ অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তীব্র ঘৃণা এবং ক্ষোভই বিরোধী দলের সাফল্যের মূল কারণ। সেই ভাবে বলতে গেলে, এটা কোনও বিশেষ দল বা জোটের সাফল্য নয়, এটা সাধারণ মানুষের জয়।

এই লোকসভা নির্বাচনে বামদুর্গের ভরাডুবির অন্যতম কারণ হল শিল্পের নামে মিথ্যাচার এবং একের পর এক উর্বর জমিকে শিল্পের নামে অধিগ্রহণ, সঙ্গে আছে মুখ্যমন্ত্রীসহ সাধারণ পার্টি-কর্মীদের দাম্ভিক আচরণ এবং দূরত্ব সৃষ্টি সহ সাধারণ মানুষের জন্য কাজ না করা। যে আদর্শ নিয়ে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল, সেই নীতি এবং আদর্শ থেকে আজ তারা অনেক দূরে সরে গেছে। যে সব শিল্পপতিদের এরা ঘৃণা করত, আন্দোলন করত, আজ তারা এদের পরম মিত্রতে পরিণত হয়েছে। পার্টি কমরেডদের বেশিরভাগের আজ পরিচয় প্রমোটার বা জমির দালাল হিসেবে। এরা পার্টির ছাতার তলায় এসেছে, পার্টিকে ভালোবেসে নয় কামাই করতে। বিভিন্ন দুর্নীতিতে লিপ্ত থেকে পার্টির ছাতার তলায় বাঁচতে। তাই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং তীব্র ঘৃণার প্রতিফলন ঘটেছে নির্বাচনী ফলাফলে। বাম সরকারের ব্যর্থতার আরও একটা বড় কারণ ২০০৪ লোকসভা নির্বাচনে সরকারের প্রাণভোমরা হয়েও তাদের সরকারে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত জনগণ ভালোভাবে নেয়নি। এবারের নির্বাচনে মানুষের রায়ে এটা পরিষ্কার যে, বামফ্রন্টের গাছের খাবো আর তলারও কুড়োবো নীতিকে বর্জন করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, মানুষ তাদের নির্বাচিত এম পি-দের কাছে কাজ চায়। চায় সঠিক সহযোগিতা। সেটা এবারের লোকসভার নির্বাচিত এম পি-দের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইউ পি এ সরকারের কাছ থেকে সাড়ে চার বছর ব্ল্যাকমেল করে সমস্ত অন্যায় সুযোগ-সুবিধা আদায় করে একেবারে শেষপ্রান্তে এসে কারাত অ্যান্ড কোং-এর পরমাণু চুক্তির ইস্যুতে সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের নাম এবার কাজে দেয়নি। একের পর এক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরের মূল সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ বামপন্থীদের অতল জলে তলিয়ে দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে তাদের সর্বৈব ব্যর্থতা কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তাদের একেবার অপ্রাসঙ্গিক এবং একঘরে করে দিয়েছে। বিরোধীদের সুযোগ দিয়ে মানুষ একবার নতুন ভোরের আশায় বুক বেঁধেছে। তারা এবার মানুষের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারে, সেটা আগামী সময় বলবে।

—এস কে দে,কলকাতা-১১৪

রাহুমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ

জ্যোতিবাবু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি কিছুটা দিব্যদৃষ্টিও অর্জন করেছেন মনে হয়। কারণ সাবালক হওয়ার পর অর্থাৎ ভোটাধিকার অর্জন করার পর এবারই প্রথম ও শেষ ভোট দিলেন না। কারণ উনি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে এবার আর হবে না। তাই উনি স্ট্রেচার ধরেও ভোট দিতে গেলেন না। অদৃষ্টের কী করুণ পরিহাস! তাইতো মমতা দেবী বলেছিলেন, জ্যোতিবাবু ভোট দিলেন না বলে সিপিএম হারল।

পশ্চিমবঙ্গের থ্রি 'বিগ বি' (বুদ্ধ, বিমান, বিনয়)-র জন্যই এই পরাজয়। এই তিনজনের উদ্দেশ্যেই যদি নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে মনে হয় সত্যের অপলাপ হবে না। যথা, ওনারা মিথ্যাবাদী (রাজ্যপালের নিকট চুক্তি করেও অস্বীকার করা) ওঁরা অসভ্য (বিরোধী রাজনৈতিক নেত্রীর উদ্দেশ্যে অশোভন কথাবার্তা), ওঁরা অশালীন (মেধা পাটকরের উদ্দেশ্যে নন্দীগ্রামের মানুষকে অসভ্য অঙ্গভঙ্গি করতে শেখানো)। এগুলি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, যার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ই ভি এম মেসিনে।

এই হারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এবারেরর ই ভি এম মেসিন আর ক্যাডার কাম হার্মাদরা। এবার যারা ই ভি এম মেসিন প্রস্তুত করেছেন, তারা যথেষ্ট বেইমানি করেছেন। কারণ ১০০টির পর যে বোতামই টেপা হোক না কেন তা সি পি এমের ঘরে চলে যাবে---এই ব্যবস্থাটা এবার করতে পারেননি। তাই এইভাবে গোহারা হার হল। এবার আসি ক্যাডার কাম হার্মাদদের কথায়। তারাও ৯৯.০৫ ভাগ নির্বাচন ক্ষেত্রে অসফল। কারণ ভোটারদের ভয় দেখিয়ে যথেচ্ছভাবে 'পিঁ' করে বোতাম টিপতে পারেনি, ভোটারদের নিজ নিজ ভোটদানে বাধা দিতে পারেনি তাই। ছোট একটি চিত্র তুলে ধরলেই তা বোঝা যাবে। রাণীগঞ্জ ও জামুরিয়ায় ওই ক্যাডারগণ কিন্তু পার্টির সঙ্গে বেইমানি করেনি। তাই ওখানে তৃণমূলীদের শূন্য থেকে দশের বেশি ভোট কোনও বুথে পায়নি, যেখানে সিপিএম পেয়েছে যথাক্রমে ৮০০, ৯০০, ইত্যাদি।

পরিশেষে বলি, পশ্চিমবঙ্গের একটা জিনিস দেখার। তা হল— পুলিশ পুঙ্গবেরা এবার কোন দলে যায়। ওরা অবশ্য বহুরূপী---সুযোগ পেলেই রং বদলাতে ওদের মতো কোনও রাজনৈকি নেতাও পারবে না।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান

সরকারি প্রশাসন

জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভের নীচে "সত্যমেব জয়তে" কথাটি সব রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস এবং গাড়িতে লেখা সাংবিধানিক নির্দেশ অনুসারে বাধ্যতামূলক। বহুক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, প্রশাসনিক গাফিলতির ফলে এই নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে না। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং অযোগ্যতা এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট ছ'বার নির্দেশ দেওয়ার পরেও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বহু অফিস এবং গাড়িতে এই নির্দেশ উপেক্ষা করা হচ্ছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে আবার একটি জনস্বার্থ মামলা চলছে। এখন প্রশ্ন হল, যে দেশ এমন সব সরকার দ্বারা পরিচালিত সে দেশের মানুষের ভবিষ্যত কোন পথে এগিয়ে চলেছে। কতকগুলো অলস এবং অকর্মণ্য লোককে লালন-পালন করাকেই কি সরকার বলে? আর যারা প্রতি পাঁচ বৎসর পরে একবার করে লোকসভা-বিধানসভায় ভোটের বাদ্য বাজিয়ে ক্ষমতায় আসে, তাদের শুধু মিটিং-মিছিল-স্লোগান এবং একে অপরের দিকে কাদা ছোঁড়াছুড়িই কি জাতীয় কর্তব্য পালনের নিদর্শন? যদি আইন মেনে চলা না চলা সরকার এবং সরকারি কর্মচারীদের মর্জির ওপরে নির্ভরশীল হয়, তাহলে এই আইন-আদালত রেখে প্রহসন তৈরি করারও কি কোনও রাজনৈতিক দলীয় নির্দেশ আছে? যদি তাই হয়, তা হলে দু-চারটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে দায়সারা কাজ করলেই তো আর কোনও জনস্বার্থ মামলা করে জনসাধারণ আদালতে ছোটছুটি করে না। যদিও কোনও সরকারের এমন বোধশক্তি থাকলে সেই সরকার এভাবে আদালত অবমাননার পরেও হাসিমুখে প্রশাসনিক পরিকাঠামোটি নিয়ে আগলে বসে থাকে না। এটা আমাদের এক জাতীয় দুর্ভাগ্য।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর
উত্তর ২৪ পরগণা

চিঠিপত্র

নারী নির্যাতন রোধে সঠিক তদন্ত প্রয়োজন

।। কল্যাণী ভট্টাচার্য।।

সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান ঘটনাবলী নির্যাতনবিরোধী প্রতিরোধ মঞ্চ কে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। মঞ্চ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এই দেখে যে, সমাজের কোমল ও পবিত্রতম বলে কথিত সম্পর্কে সম্পর্কিত মানুষদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠছে তাদের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নাবালিকার ওপর পাশবিকতম অত্যাচার সংগঠিত করার। আবার উচ্চশিক্ষিত মহল থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তর থেকে আসছে নারী-নির্যাতন, বধূহত্যার মতো

জনমত

নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের খবর। আবার কেবল স্বামীগৃহে নয়-পিতৃগৃহেও কন্যারা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ অভিযোগ স্তম্ভিত ও নির্বাক করে দিচ্ছে সবাইকে।

সমাজের সর্বস্তর থেকে নারী নির্যাতনের ঘৃণ্যতম অপরাধের অভিযোগ উঠছে কেবল তাই নয়, এর বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী প্রতিরোধও গড়ে উঠছে না----এ আভাস দিচ্ছে এমন এক মূল্যবোধ বিপর্যয়ের, যার প্রভাব সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক তো বটেই, সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

এই মঞ্চ তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন রাখছে সমস্ত ধরনের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ এবং সক্রিয় হওয়ার জন্য। যেসব সংগঠন মেয়েদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করছে তাদের সবার কাছে আবেদন রাখছি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। একই সঙ্গে এই মঞ্চ দাবী করছে নারী নির্যাতনের অপরাধের মামলাগুলোর তদন্তে পুলিশের তরফে যেন কোনও গাফিলতি না থাকে তা সুনিশ্চিত করার জন্য। পুলিশি তদন্তে গোড়ায় গাফিলতি থাকলে পরবর্তীকালে তা সংশোধন করে অপরাধীর শাস্তি সুনিশ্চিত করা কোনওমতেই সম্ভব নয়। তাই প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি সুনিশ্চিত এবং আক্রান্ত ও নির্দোষের রক্ষার জন্য মঞ্চ

দাবী জানাচ্ছে ধর্ষণ ও বধূহত্যার মতো গুরুতর অপরাধের প্রতিটি মামলার তদন্ত করুক উচ্চপদস্থ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারেরা। মঞ্চ দাবী করছে প্রতিটি ধর্ষণের মামলায় দ্রুততম মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডাক্তারদের নির্দেশ দেওয়া হোক, দাবী করছে প্রতিটি ময়না তদন্ত করা হোক সুপ্রিম কোর্টের নীতি নির্দেশিকা মেনে। আক্রান্ত ও মৃতপ্রায় বধূদের অন্তিম জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর হোক পুলিশ।

আইনের চোখে সর্বস্তরের মানুষ যে সমান---তা সুনিশ্চিত হোক আরক্ষা দপ্তরের আচরণে। বধূহত্যা কিংবা ধর্ষণের মত ঘটনার ক্ষেত্রে অপরাধী যেন শাস্তি এড়াতে না পারে, তা সুনিশ্চিত করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

বীর সাভারকরের জন্মোৎসব

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও হিন্দু রাষ্ট্রবাদের প্রবক্তা বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ১২৬তম জন্মজয়ন্তী পূর্তি উৎসব হিন্দু মহাসভার সভাঘরে উদ্‌যাপন করা হয়। এই সভায় রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে বীর সাভারকরের অবদান ও বর্তমান কালে সাভারকরের ভাবনা-চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। সভার সভাপতিত্ব করেন হিন্দু মহাসভার প্রবীণ নেতা জিতেন্দ্রনাথ সরকার।

সভায় অপর বক্তা সন্দীপ মুখার্জি বলেন, কয়েক দশক ধরে সাভারকরের তত্ত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াস আজ ধীরে-ধীরে অসফল হচ্ছে। আর তাতেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। অদূর ভবিষ্যতে সাভারকর বর্ণিত জাতি তত্ত্বের চরম সমাধান ঘটবেই।

এদিন কলকাতার কোনও একটি রাস্তা, পার্ক, চৌরাস্তা ইত্যাদি বীর সাভারকরের নামে নামকরণ করার জন্য কলকাতা পৌরসভার কাছে দাবী জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সাভারকরের ১২৬তম জন্ম দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল বীর বিনায়ক সাভারকরের ১২৬তম জন্ম দিবস। ২৮ মে বাঁকুড়া শহরে সাভারকর সরণিস্থিত ব্রোঞ্জ মূর্তির পাদদেশে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। মহাসভার প্রবীণ নেতা তথা বাঁকুড়া পৌরসভার প্রাক্তন উপ-পৌরপ্রধান ভক্তিপদ পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মুখ্য বক্তারূপে বক্তব্য রাখেন গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তনের সহ-প্রধান শিক্ষক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহাসভার প্রাদেশিক সহ-সভাপতি অরূপ মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন সভার শুরুতে লাঠি, ছোরা খেলা সহ বিভিন্ন শারীরিক প্রদর্শনীও হয়। বৃন্দাবন বরাট দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রয়াত শ্যামল পালের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৯ মে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গের প্রান্ত কার্যালয়---মাধব ভবনে প্রয়াত প্রচারক শ্যামল পালের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সঙেঘর বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পর, তিনি বিজেপি-র শিলিগুড়ি বিভাগের সংগঠন সম্পাদক ছিলেন।

গত ২৫ মে কলকাতার বিশুদ্ধানন্দ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিডনির ব্যাধিতে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে চলে গেলেন তিনি।

এদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত কার্যকর্তারা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। স্মৃতিচারণ করেন প্রবীণ প্রচারক দেবব্রত সিংহ, প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত, রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক প্রমুখ। এ ছাড়া বিজেপি রাজ্য সম্পাদক মলয় মজুমদার, বিহার রাজ্য বিজেপির কোষাধ্যক্ষ তথা কিষাণগঞ্জ মেডিকেল কলেজের ডিরেক্টর দিলীপ জয়সওয়াল সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। এদিন বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত শ্যামল পালের বড়দা অজিত পাল।

সমাবেশ সমাচার

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান

এ বছর ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান পাচ্ছেন কর্ণাটকের রাঘবেশ্বর ভারতী মহারাজ। গো-পালন ও সেবার ক্ষেত্রে প্রতি তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান

দেওয়া হচ্ছে। 'বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়' প্রতি বছরই এই সম্মান প্রদান করে থাকে। এবারে এই সম্মান কুড়ি বছর পূর্ণ করবে। আগামী ১৩ জুন সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার 'কলামন্দির' প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে এই সম্মান জানানো হবে। ভারতী মহারাজের হাতে হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান তুলে দেবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী।

পরম্পরা

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দেওরহা বাবা

।। বৈদেহীনন্দন রায়।।

১৯৯১-এর ২০ আগস্ট। ভোরের আলো সবে দেখা দিয়েছে নিকষকালো আকাশের বুকে। ঠিক সেই সময় বেতার মারফত সারা পৃথিবীতে ভেসে এল এক চমক ধরানো সংবাদ। ঠিক যেমনটি হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা-নাগাসাকিতে মার্কিন পারমানবিক বোমা বর্ষণে। টানটান উত্তেজনা সারা বিশ্ব জুড়ে। দীর্ঘায়িত দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার কালো ছায়া সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার ঘরে-ঘরে। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা কেবল অবিশ্বাস্য সেই পালাবদলের শেষ অঙ্ক দেখার।

আগের দিন অর্থাৎ ১৯ আগস্ট রক্তপাতহীন এক ঝটিকা অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হলেন সুপ্রিম সোভিয়েতের অবিসম্বাদী নেতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচভ। রাষ্ট্রপতির গদিতে বসলেন ষড়যন্ত্রের নায়ক গেন্নাদি ইয়ানভ। আর ষড়যন্ত্র-কারীদের চাপেই বলা যায় সংবাদ সংস্থা তাস জানাল যে, খবরটা সোভিয়েতবাসীরা মেনে নিতে পারেনি তার সত্যতা। সুদূরপ্রসারী এক চক্রান্তের গন্ধ পেলেন তাঁরা।

খবর ছিল, গর্বাচভের অসুস্থতা হেতু উত্তরসূরীরূপে ইয়ানভ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতির কার্যভার। বাস্তবে সোভিয়েত জনগণের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা তখন চলে গেছে সদ্য গঠিত স্টেট কমিটির হাতে। যার প্রধান তিন সদস্য হলেন কেজিবি প্রধান ভ্লাদিমির ক্রুচকভ, প্রধানমন্ত্রী ভ্যালেন্টিন পাভলভ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুগো। দেশবাসীকে তাঁরা জানালেন, গর্বাচভ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ক্রিমিয়ায় বিশ্রামে আছেন। সেজন্য ইয়ানভের পদভার গ্রহণ। কিন্তু গর্বাচভ কার্যত গৃহবন্দী কেজিবির এজেন্টদের হাতে।

এই বার্তার ঠিক পরেই সারা দেশে জারি হল জরুরি অবস্থা। পথে নামল লালফৌজের ট্যাঙ্কবাহিনী। প্রাথমিক বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে হাজার হাজার মানুষ সেদিন মস্কোয় পথে-ঘাটে গড়ে তুলল দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ। মরনপণ করে বরিস ইয়েলৎসিনের নেতৃত্বে। ভেঙে পড়ল নবীন শাসকদের ক্ষমতার স্বপ্নসৌধ প্রবল প্রতিরোধের মুখে। ২০ আগস্ট অপরাহ্নেই ইস্তফা দিলেন ইয়ানভ ও তার সঙ্গীরা। ফিরে এলেন আবার গর্বাচভ পূর্বতন দায়িত্বে। অবশ্য কয়েক মাসের জন্য। সুচতুরভাবে তাঁকে সরিয়ে ইয়েলৎসিন তুলে নিলেন সর্বময়কর্তৃত্ব। গর্বাচভের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ইতি টানা হল সোভিয়েতের ৭৪ বছরের সাম্যবাদী ভাবনার দীর্ঘ ইতিহাসের। ফাটল দেখা দিল সোভিয়েতের ঐক্য ও সংহতিতে। স্বাধীনতা ঘোষণা করল প্রথম বাল্টিক প্রদেশগুলি। তারপর অন্যান্য রাজ্যসমূহ। মুছে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল অস্তিত্ব। স্থান হল ইতিহাসের পাতায়।

সোভিয়েতের এই আকস্মিক পালাবদলের কারণ নিয়ে বিশ্বের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা যতই জল্পনা চালান, তার এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির আগাম ইঙ্গিত কেউ দিতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে নষ্ট্রাডামাস তাঁর ৪ শতকের ৩২ চতুষ্পদীতে যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তা সুস্পষ্ট নয়। স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ভারতের এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। ব্রহ্মর্ষি দেবরহা বাবা। জনপরিচিতি যোগেশ্বর বা যোগীরাজ দেওরাহা বাবা। ভবিষ্যত বাণীটি করেন ১৯৯৯-এর মার্চ মাসে অর্থাৎ মহাপ্রয়াণের ৩ মাস আগে। বৃন্দাবনে।

।। দেবরহা বাবার ১৯৩তম তিরোধান তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।।

দেবরহা বাবার তপোভূমি সদৃশ আশ্রমে সেসময় (১৯৯০) আসেন এক রুশ সাংবাদিক। উদ্দেশ্য ভারতের এই প্রবাদ-প্রতিম মহাযোগীর কাছ থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার গতি ও বিশ্বের ভবিষ্যত ঘটনাবলীর আগাম তথ্য আহরণ। কথাবার্তা হয় জনৈক দোভাষীর মাধ্যমে। কথা প্রসঙ্গে বাবা জানান, রুশ সাংবাদিককে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের কথা। বলেন, গর্বাচভ নীতিগতভাবে সৎ লোক। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা তা নয়। আগামী সময় তাঁর পক্ষে সুখপ্রদ হবে না। সোভিয়েত মুখোমুখি হবে সার্বিক ভাঙনের। বাল্টিক রাজ্যগুলির ভাঙনের মধ্য দিয়ে হবে তার সূত্রপাত। বলাবাহুল্য সে ভবিষ্যত বাণীর প্রতিটি কথা সত্যে পরিণত হয়েছিল।

এরপর ঘটে আরও একটি ঘটনা, সেই রুশ সাংবাদিককে ঘিরে। বাবার সাক্ষাৎকার সেরে সেদিনই তাঁর ট্রেনে মুম্বাই যাওয়ার কথা। বাবা তাকে যেতে নিষেধ করেন। সাংবাদিক ভদ্রলোক বাবার কথায় ঠিক আস্থা রাখতে পারছিলেন না। বারবার বলাতে অবশেষে তিনি যাত্রা বাতিল করেন।

পরদিন সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলাতেই চমকে ওঠেন সেই সাংবাদিক। যে ট্রেনে মুম্বাই যাওয়ার কথা, ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। বারবার তিনি ধন্যবাদ দিতে থাকেন বাবাকে। যাঁর কৃপায় তিনি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন।

ঘটনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় এলাহাবাদের 'নর্দার্ন ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ২২ জুন সংখ্যায়। পরবর্তীকালে তথ্য বিষয়ে আরও নিশ্চয়তা লাভ করি বাবার একান্ত সেবকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে।

পরবর্তী পর্যায়ে রুশ সাংবাদিক মারফৎ বাবার বার্তা পাওয়ার পর গর্বাচভ নিজেই দেবরহা বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেন। ঠিক হয় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে আসবেন বাবার দর্শনে। কিন্তু তাঁর (বাবার) সঙ্গে যে গর্বাচভের দেখা হবে না সে ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন তিনি রুশ সাংবাদিককে দ্বিতীয়বার দেওয়া সাক্ষাৎকারে। কারণ তার আগেই অর্থাৎ ১৯ জুন বাবা চলে যান মহাসমাধিতে।

গর্বাচভ যে বাবার ব্যক্তিত্বকে রীতিমতো শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন, তা আরও সুস্পষ্ট হয় বাবার মহাসমাধির পর। বস্তুত তাঁর জন্যই বাবার তিরোধানের সংবাদ সোভিয়েতের মুখ্য সংবাদ মাধ্যম সমূহে ছাপা হয় গুরুত্বের সঙ্গে।

সোভিয়েত দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয় বাবার সঙ্গে রুশ সাংবাদিকের বিশেষ সাক্ষাতকার পর্বটি।

আমাদের ভাবধারা

মন ও মনের শুদ্ধতা

।। চৈতালী চন্দ।।

আমাদের শরীর একটি গাড়ি। গাড়ি যেমন দৃঢ় না হলে সেটাকে চালানো যায় না, তেমনি আমাদের শরীররূপী গাড়িও দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। তাই প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। তবে শরীররূপী গাড়ি চালানোর জন্য প্রয়োজন ভালো ড্রাইভার। এই ড্রাইভার হল আমাদের মন।

মনের সঠিক অবস্থান আমরা জানি না। মনের আকারও আমি জানি না,তবে জীবনে চলার জন্য মনের প্রেরণা খুবই প্রয়োজন। এবং মন আমাদের সঙ্গেই থাকে। মন অত্যন্ত চঞ্চল। একবার যদি সে আমার হাতের বাইরে চলে যায় তবে তাকে ফেরানো মুশকিল। মন আমার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতে সময় লাগবে না। জীবনের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য হল শুদ্ধ মন। এর জন্য সাধনা প্রয়োজন। এই সাধনা সহজ নয়। মন শুদ্ধ হলে বুদ্ধি শুদ্ধ হবে, চরিত্র শুদ্ধ হবে। চরিত্র শুদ্ধ না হলে সব শিক্ষাই ব্যর্থ। চরিত্রহীন ব্যক্তির জীবন সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

মানুষের মৃত্যু হলে শরীরের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মা অমর। আত্মা আবার নতুন দেহ ধারণ করে। পূর্ব জীবনের কর্ম অনুযায়ী পরবর্তী জীবনের দেহ ও মন তৈরি হয়। এক কৃতকর্মের ফল আমাদের অন্য জন্মে ভোগ করতে হয়। পূর্ব জীবনের কর্ম ও সংস্কার সব সঞ্চিত থাকে। একেই বলে ভাগ্য।

এই কর্মরহস্য বুঝতে পারলে আমরা দুষ্কর্ম থেকে নিজেকে দূরে রাখব। ফলে সৌভাগ্যের অধিকারী হব। এই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য আর্দশ জীবন গঠন করতে হবে। জীবন গঠনে মূল উৎসাহ দেয় মন। তাই প্রত্যেকের জীবনে মনের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য ঘরবাড়ি

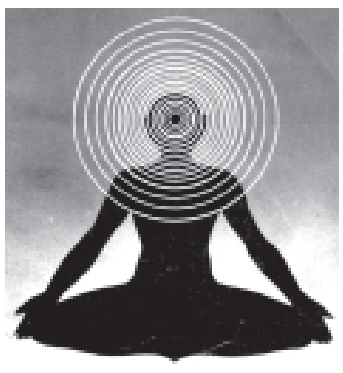

সাজানোর সঙ্গে সঙ্গে মনকেও নানা অলংকারে সাজাতে হবে। মনে দৃঢ় সংকল্প রাখতে হবে। যে কোনও কাজ বিশেষ বিচার করে করতে হবে। কখনও কারও অনিষ্ট করার চিন্তা মনে আনা চলবে না। অপকারীর প্রতিও শুভ ভাবনা রাখতে হবে। মন শুদ্ধ করার প্রধান উপায় ধ্যান বা রাজযোগ। নিত্য প্রার্থনায় বসতে হবে--ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে বলতে হবে— "হে ভগবান, আমার বুদ্ধি কে সৎপথে চালাবার জন্য মন তৈরি করে দাও।" মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ, সঙ্গীত চর্চা, চিত্রাঙ্কন, সৎসঙ্গ, ফল ও ফুলের বাগান করা ইত্যাদি কর্ম মনকে শুদ্ধ করে। শুদ্ধ আহার (নিরামিষ আহার) শুদ্ধ মন তৈরি করতে সাহায্য করে। শুদ্ধ মনের দ্বারা শুদ্ধ কর্ম করে নিজের জীবনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে আমাদের কৃতকর্মের ফল আমাদের সুখী করে।

।। ওঁম শান্তি ।।

বাংলাদেশে রামায়ণ গান খুবই জনপ্রিয়

বি স কে, কলকাতা।। বাংলাদেশে রামায়ণই সুফিবাদের মাধ্যমে সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি। ইসলামিক পণ্ডিত এবং বাংলা একাডেমি, ঢাকার সদস্য জাকারিয়া জানিয়েছেন। সম্প্রতি আগ্রায় অনুষ্ঠিত সার্ক (সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়শন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন)-এর সাহিত্য সম্পর্কিত উৎসবে যোগ দিয়ে একথা জানান জাকারিয়া। বাংলাদেশের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি এবং সুফিবাদের মাধ্যমে রামায়ণের কাহিনীকেই প্রধান উপজীব্য করায় তা চরম জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তবে এই পরম্পরা দীর্ঘদিনের। পীরগান (মুসলিম ফকির), গাজি গান (মুসলিম পুরোহিতের গান), গাজিল পালা (মুসলিম পুরোহিতদের নাটক), বেহুলার নাচ (বেহুলা নাচ) এবং পদ্মার নাচ (পদ্মানদীর তীরবর্তী অঞ্চলের নাচ)— এসবের মধ্যেই রামায়ণ ঢুকে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে। জাকারিয়া জানান, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রামায়ণ গানের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মধুর সম্পর্কের কথা তুলে ধরার পরম্পরা রয়েছে। রামায়ণের শিক্ষা সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে দারুণ প্রভাব সৃষ্টিকারী সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত। দুর্গা পুজোর সময় এই গীতিনাট্য দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই শোনা যায়।

শুধুই লেখা-পড়া নয়, সন্তানের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সতর্ক হোন

।। মিতা রায়।।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী বার্ষিক পরীক্ষার পর নতুন সেশন চালু হয়ে গেল। সেদিন দেখা হল সৌমিলির সঙ্গে।

অঙ্গনা

'কেমন আছিস' বলতে চটজলদি উত্তর এল---উফ ! কিছুদিন যা টেনশন গেল মেয়ের পরীক্ষা নিয়ে। এবার এইট হল। এখন তো আরও চাপ বাড়বে। ওর মেয়ে খুব সুন্দর গান করে। 'হ্যারে, ওর গান কেমন চলছে?' গান ? এখন ওসবের কথা ভুলে যা। সময় কখন ? রোজই পড়তে যাওয়া, হোমওয়ার্ক। একেবারে নাজেহাল অবস্থা।

আমার পাশেই এক বউদি থাকেন। তার মেয়ে ক্লাস টেনে উঠল ভালো রেজাল্ট করে। টেন মানেই তো সামনে শমন। কিন্তু লক্ষ্য করি, গার্গীর নাচের রেওয়াজ রোজই চলছে। বার্ষিক পরীক্ষার সময়েও এখনও। এই তো সেদিন নাচের দিদির সঙ্গে বাইরে প্রোগ্রাম করে এল। আসলে বউদি নিজে গুণী। তাই মেয়ের ক্ষেত্রে তার প্রতিভাকে দমিয়ে বা থামিয়ে দিতে পারেন না। হোক না পড়াশুনার চাপ। কিন্তু তার জন্য তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ বন্ধ করে দিতে হবে ? বরং পড়ার চাপের পাশাপাশি এটা একটা রিল্যাকসেশন। একদম ঠিক কথা। জীবনে দাঁড়াতে গেলে পড়াশোনার যেমন প্রয়োজন তার সঙ্গে মনের স্ফূর্তি, ইচ্ছা এবং সর্বোপরি নিজস্ব প্রতিভা বিকাশেরও উপযুক্ত শিক্ষা প্রয়োজন। বাবা-মা'কে এ ব্যাপারে অবশ্যই ভাবতে হবে যে, শুধুমাত্র পড়াশোনাই একমাত্র ভবিষ্যত নয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি সন্তানের প্রতি বাবা-মা জেদ ধরে বলেন, সন্তানকে লেখাপড়া শিখে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু সন্তানের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে কখনই বিসর্জন দিয়ে নয়। এতে অনেক সময়ে বাবা-মা'র জেদের কাছে সন্তান অসহায় হয়ে পড়ে এবং তাদের আশা না রাখতে পারলে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়। শুধু পড়াশোনার বেশি গুরুত্ব না দিয়ে সে কী চায় সেটার খবর রাখতে হবে। সুস্থ ভবিষ্যতে সুস্থ নাগরিক করে তুলতে পড়াশোনার পাশাপাশি অন্য দিকটায় নজর দিতে হবে। অনেকেই বিশেষ গুণের অধিকারী হয়, পড়াশোনায় তেমন মাথা নেই। কিন্তু সেই গুণের স্ফুরণ ঘটালে দেখা যায়, সে তার নিজস্বতায় সমাজে বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছে।

আমরা দৈনিক সংবাদপত্রে ইদানীং দেখতে পাই, কোনও ছেলে বা মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে পরীক্ষার আগে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে তার স্বীকারোক্তি ঃ মা এত বেশি পড়ার চাপ দেন, অনেক অনেক ভালো রেজাল্ট চাই। অথচ, আমি ভালো রেজাল্ট করেই থাকি। এর ওপরে অতিরিক্ত চাপ দেওয়ায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করার ফলে সন্তানকে আমরা ক্ষতির পথই দেখিয়ে দিচ্ছি। এ তো গেল একদিক। আবার ইদানীং দেখা যাচ্ছে, স্কুলের ক্লাসে ওঠা পরীক্ষায় ভালো ফল না করতে পারলে ফুলের মতো সন্তান আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। এর মূলেও সেই বাবা-মা'র উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সুতরাং, মা-বাবার আশা কি এবং সন্তানই বা কী চায়--- তা নিয়ে একসঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা ভীষণ জরুরি। এটা ঠিক যে, বাবা-মা নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি বা নিজের অপূরণীয় ইচ্ছাকে সন্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করতে চান। ঠিকই, তবে সন্তানের অনিচ্ছার ওপর চাপিয়ে দেওয়া সঠিক নয়, এতে হিতে বিপরীত হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখে নিতে পারি, অভিজ্ঞ শিক্ষিকা, মনোবিদ ও অভিভাবিকার মতামত। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা উৎপলা দত্ত বললেন----দেখুন, আমাদের সময়ে সন্তানদের নিয়ে মা-বাবাদের এত মাথাব্যথা ছিল না। যৌথ পরিবারে অনেক ভাইবোনের মাঝেই বড় হয়েছি। মা শুধু বলতেন সু-সন্তান হও , পড়াশোনায় মন দিয়ে বাকি সব কর। ভবিষ্যতে দেখা গেল, সবাই আমরা সুশিক্ষিত হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

অভিভাবিকা রিমা দে জানালেন, আমরা এ যুগের মা। আমরা শিক্ষিত, সুতরাং আমার সন্তান শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত হবে---এ আশা তো সবারই। এ ছাড়া, এখন কমপিটিশন-এর যুগ। ওকে লড়তে হবেই।

বিশিষ্ট মনোবিদ ডঃ রেণু গুহর বক্তব্য ঃ এখনকার দিনে একটি বা দুটি সন্তান, তার ওপর বাবা-মা'র উচ্চাশা সন্তানের কাছ থেকে। সন্তান 'অল স্কোয়ার' হবে এই স্বপ্নকে সফল করতে গিয়ে তার জীবন দুর্বিসহ। পড়ার চাপ, কমপিউটারের চাপ এদের মেশিন করে দিচ্ছে। কেরিয়ার সর্বস্ব হতে গিয়ে সূক্ষ্ম মানসিকতার বিকাশ ঘটছে না। যা সুস্থ জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর।

বিভিন্ন অভিমতের নিরীখে এটাই বলা যায়, সন্তানকে সুস্থ সুন্দর সংস্কৃতিবান সামাজিক করে গড়ে তুলতে গেলে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলো, গান, বাজনা, আঁকার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং সেটা দেখার দায়িত্ব অভিভাবকের।

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

সারা দেশে ২৭ হাজার একল বিদ্যালয়

সারা দেশে ২৬,৭২৪টি একল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, সাস্থ্য সচেতনতা এবং ভারতীয় পরম্পরাগত সংস্কৃতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উৎকৃষ্টতার সম্মানে ভূষিত হল। ভারত বিকাশ পরিষদ, হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে এই সম্মান ঘোষণা করা হয়। একল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আর্থিক স্বনির্ভরতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়েও প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে ফাউণ্ডেশনের পক্ষে জানানো হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যাতে স্বাস্থ্য, শিশু রক্ষা ও জীবন ধারণের সুযোগ নিতে পারে সেই শিক্ষা বিস্তারের কারণেই একল বিদ্যালয় ফাউণ্ডেশনের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

—বি স কে, কলকাতা।।

ডাঃ হেডগেওয়ারকে নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের অনুমতি দিচ্ছে না কেন্দ্র

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে নিয়ে 'স্বয়ংসেবক' নামে তথ্যচিত্রটির প্রদর্শনে কেন্দ্র সরকার অনুমতি দিচ্ছে না। জাতীয় চলচ্চিত্র বোর্ডের অনুমতি ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। ছত্তিশগড়ের রাজ্যসভা সদস্য শ্রীগোপাল ব্যাস এবিষয়ে রাজ্যসভায় অভিযোগ জানান।

ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে মনমোহন সরকার ডাঃ হেডগেওয়ারকে নিয়ে 'স্বয়ংসেবক' তথ্যচিত্রটির প্রদর্শনে অনুমতি দিচ্ছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন।

—বি স কে, কলকাতা।।

আন্তর্জাতিক

তিয়েন আনমেন বিক্ষোভের ২০ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ঠিক ২০ বছর আগে ১৯৮৯ সালের ৪ জুন বেইজিং-এর তিয়েন আনমেন চত্বরে চীনের স্বতঃস্ফূর্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল নির্মম কমিউনিস্ট শাসকরা। ছাত্রদের ওপর চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল ট্যাংক। তিয়েন আনমেন হত্যাকাণ্ডে ঠিক কতজন নিহত হয়েছিল তা আজও অজানা। তবে ধারণা করা হয়ে থাকে ৫০০ থেকে ১০০০-এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারায়। বিক্ষোভকারীদের নৃশংসভাবে দমনের ছবি দেখে ক্ষুব্ধ হয় সারা বিশ্বের মানুষ। কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সেই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে এখনও নীরব।

তিয়েন আনমেন চত্বরে চীনা সৈনিকদের রক্তক্ষয়ী দমন অভিযান ঘটেছিল বিশ্ববাসীর চোখের সামনে। প্রবল বিস্ময়ে হতবাক মানুষ তার ছবি দেখেছিল টেলিভিশনের পর্দায়। এমনিতে তখন খুব কম সংবাদ মাধ্যমের বেইজিং-এ স্থায়ী রিপোর্টার ছিল ।

কিন্তু শহর ছিল সাংবাদিকে ভরা। কেননা, তখনকার সোভিয়েত নেতা মিখায়েল গর্বাচভ তাঁর ঐতিহাসিক চীন সফরে গিয়েছিলেন ১৯৮৯ সালের মে মাসে। ৩০ বছরে সেটাই ছিল কোনও সোভিয়েত রাষ্ট্র-প্রধানের প্রথম চীন সফর।

গর্বাচভ চীন ত্যাগ করার পরও বেশ কিছু সাংবাদিক বেইজিং-এ থেকে যান। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই তিয়েন আনমেন চত্বর ছিল গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের দখলে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে, আইনের শাসনের তীব্র অভাবের বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল বিক্ষোভরত ছাত্ররা। অনশন ধর্মঘটে নামে বহু ছাত্র। তখনকার চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ঝাও জিয়াং বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন। অনুরোধ করেন তাদের অনশন ভাঙতে।

কিন্তু তার পাঁচ ঘণ্টা পর ক্ষমতাচ্যুত হন ঝাও। কেননা, সামরিক কায়দায় গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দমনের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। তাই তাঁকে সরে যেতে হয়। ২০০৫ সালে মৃত্যু পর্যন্ত ঝাও ছিলেন গৃহবন্দী।

১৯ মে বেইজিং-এ জারি করা হয় সামরিক আইন।

অবশেষে ৪ জুন চীন সরকার বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। নৃশংসভাবে দমন করা হয় ছাত্রদের অহিংস বিক্ষোভ তৎপরতা। বিদেশী সাংবাদিকরা সরাসরি সেইসব খবর ছড়িয়ে দেন সারা পৃথিবীতে।

চীন এভাবেই পিষে দিয়েছে গণতন্ত্রের কণ্ঠ।

১৯৮৯ সালের সেই ছাত্র বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন বেইজিং স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির ছাত্র ঝাং জিয়ান।

তখন তাঁর বয়স ১৮। কীভাবে চীনা সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল, ট্যাংক নিয়ে চড়াও হয়েছিল নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর, স্বচক্ষে দেখেন তিনি। তাঁরই পাশে গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় এক ছাত্রের রক্তাক্ত দেহ। ঝাং পালিয়ে যাননি।

বরং প্রবল ক্রোধে মুখোমুখি হন সৈনিকদের। সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি টি-শার্ট খুলে চিৎকার করে বলি, করো গুলি, চালাও গুলি। সেই মুহূর্তে আমি বোধহয় আমার জীবন দিতে পারতাম। ওঁদের কাছে আমরা যেন মানুষ নই, আমরা যেন আগাছা। সেই আগাছাই নির্মূল করছে ওরা। ওদের বললাম, আমরা চীনারা অত সস্তা নই। ছোট্ট কুকুর নই যে ভয়ে কুঁকড়ে যাব। একজন অফিসার ততক্ষণে বন্দুক তাক করেছে আমার দিকে, গুলি এসে লাগে আমার উরুতে'।

তিন তিনটে গুলি খেয়েও প্রাণে বেঁচে যান ঝাং। বারো বছর অন্য নাম নিয়ে তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। ২০০১ সালে পালিয়ে চলে আসেন প্যারিসে। চীনে বিরুদ্ধ মতের মানুষদের সঙ্গে নিয়মিত ইন্টারনেট কনফারেন্স-এর আয়োজন করেন তিনি। চীনা শাসকদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে চান ঝাং জিয়ান।

পশ্চিম এশিয়ার শান্তি-প্রক্রিয়া আমেরিকার ভূমিকা ধোঁয়াশাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রক্রিয়া ধীরে-ধীরে জটিল আকার ধারণ করছে। ইজরায়েল মনে করছে, ইরানের হাতে পরমাণু অস্ত্রসম্ভার আগামীদিনে বড় ধরনের বিপদ ডেকে

ওবামা

আনতে পারে তাদের দেশের জন্য। সেই কারণে এখনও প্যালেস্তানীয়দের সঙ্গে শান্তি প্রক্রিয়ায় যেতে বেশ কিছুটা অনাগ্রহী দেখাচ্ছে ইজরায়েলকে। ইজরায়েলের দীর্ঘদিনের মিত্র আমেরিকা। কিন্তু আমেরিকার মসনদে পালাবদল হওয়ার দরুণ ইজরায়েল সম্পর্কিত বিদেশনীতিরও বেশ কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে ওবামা প্রশাসন। তাই আমেরিকার মন বুঝতে গত ১৮ মে ইজরায়েলের সদ্য পুনর্নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতেনিয়াহু আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে বারাক ওবামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই বৈঠকেই দু'পক্ষের মতানৈক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। ওবামা বৈঠকে ইঙ্গিত দেন, দ্বি-পাক্ষিক সমাধানের ভিত্তিতেই আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে হবে। প্রকারান্তরে, ওবামার দেওয়া সমাধান সূত্র যে আজকের দিনে অচল, তা জানিয়ে দেন ইজরায়েলীয় প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন। সেই সঙ্গে তাঁর আরও বক্তব্য ছিল যে, পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়া থেকে ইরানকে আলাদা করে দেখা ঠিক হবে না। ইহুদি রাষ্ট্রের পক্ষে ইরানের পরমাণু কর্মসূচী যে মঙ্গলজনক হবে না সেই যুক্তিও দেখিয়েছিলেন বেঞ্জামিন নেতেনিয়াহু।

অপরদিকে এ নিয়ে ইরানের সরকারি বক্তব্য হল NPT-তে (Non-Proliferation Treaty) স্বাক্ষরকারী হিসেবে তাদের শুধুমাত্র শান্তি প্রক্রিয়ার জন্যই পরমাণু সাজ সরঞ্জাম সরিয়ে রাখা জরুরী। কিন্তু এর পেছনে অন্য যে উদ্দেশ্যটি কাজ করছে বলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন, তা হল সমস্ত পরমাণু অস্ত্রসম্ভার ইরান যদি আয়ত্ত্বও করে নেয় তবুও তা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়ত সম্ভবপর হবে না। কারণ আয়তনের দিক দিকে ইজরায়েলের আকৃতি এমনিতেই ছোট, তার ওপরে একটা বড় সংখ্যায় প্যালেস্তানীয় জনগণ ইজরায়েলের ভেতরে ও বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। সুতরাং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ একেবারে অসম্ভব বুঝেই ইরান সরকারিভাব এমনটাই জানাচ্ছে বলে কূটনীতিকরা মনে করছে। তাদের ধারণা, মার্কিনদের পরোক্ষ সহযোগিতাতেই ইরানের এহেন কূটনৈতিক চাল। পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আমেরিকার ভূমিকাটা অনেকটা ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়েছে। কূটনৈতিক মহলের ধারণা পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়ায় আপাতত দু'নৌকায় পা দিয়েই চলবে ওবামা প্রশাসন।

ঠেলার নাম বাবাজী

সন্ত্রাস রুখতে ইরান-আফগান-পাক সম্মেলন

সংবাদদাতা।। ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান---এই তিনটি দেশই এখন ঠেলায় পড়েছে। সেই ঠেলা সামলাতে গত ২৫ মে তিনটি দেশের রাষ্ট্রপতিদের ইরানের রাজধানী তেহরানে এক আঞ্চলিক সম্মেলন হয়ে গেল। উদ্যোক্তা ইরান-এর রাষ্ট্রপতি আহমেদিনেজাদ। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল---'কিভাবে উগ্র ইসলামী সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক দ্রব্যের চোরাকারবারের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়'।

সম্প্রতি আফগানিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলে তালিবান নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সরকারি নিরাপত্তাবাহিনী কয়েকদিন ধরে অভিযান চালায়। সেই অভিযানে বিপুল পরিমাণ আফিম বাজেয়াপ্ত করে, যা ইদানীংকালে হয়নি। সেইসঙ্গে সন্ধান পায় আফিম উৎপাদন ক্ষেত্রেরও। সবটাই নিয়ন্ত্রণ করে তালিবানরা। এই অভিযানে আফগান বাহিনীর হাতে যাটজন তালিবান জঙ্গি নিহত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ব্যাপক পরিমাণে আফিম চাষ হয়। পরে তা থেকে প্রসেস করে উন্নত ধরনের মাদক তৈরি করে ভারত, বাংলাদেশ এবং আরব দেশগুলিতে এমনকী আমেরিকাতেও চোরাপথে রপ্তানী করা হয়। এতে দুটো উদ্দেশ্য একযোগে সিদ্ধ হয়। (এক) ওইসব দেশের বিশেষত, ভারত ও আমেরিকার যুবকদের নেশাগ্রস্ত করে বিপথচালিত করা, (দুই) মাদক পাচারের বিপুল পয়সায় বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়া। আর এই মাদকের মুনাফার বড় একটা অংশ হাওলার মাধ্যমে 'আল কায়েদা'র তহবিলে জমা পড়ে। এ ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। ওইসব দেশের সরকারের একটা প্রভাবশালী মহলের যে মদত একাজে রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওই সম্মেলনে আহমেদিনেজাদ বলেন, এই তিনটি দেশই মাদক ও মানব পাচারের কুফলের শিকার। এর ফলে তাদের দেশগুলির ওপর চাপ বাড়ছে। এ ছাড়া অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। সুদূরে অবস্থিত বিভিন্ন দেশ থেকে এই অঞ্চলে সন্ত্রাস এবং অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ চালানো হচ্ছে। জোর করে নানা শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওইসব হস্তক্ষেপকারীদের কারও সঙ্গেই তাদের দেশের কোনও ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নেই। তবুও তারা এখানে শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তার নামে সেনা পাঠিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আফগানিস্তানে আমেরিকার সেনার উপস্থিতিরও কড়া সমালোচনা করেন।

আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী তিনটি দেশ মিলে একযোগে এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গড়ার প্রস্তাব দেন যা নিয়মিতভাবে মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা করবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ইরানে আমেরিকা অনুগত রাজা আহমদ রেজা শাহ পহলভিকে আয়াতুল্লা খোমেইনির নেতৃত্বে ব্যাপক ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতাচ্যুত করেছিল আশির দশকে। রাজা আমেরিকায় পালিয়ে বেঁচেছিলেন। আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য বাবাদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পাকিস্তান ভারতের জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসী পাঠাচ্ছে ইসলামের নামে জেহাদের জন্য। গত ৬০ বছর যাবৎ এই কাজ তারা প্রকাশ্যে করে চলেছে। আর আফগানিস্তানেই বিশ্বত্রাস লাদেন তার বিশ্বব্যাপী আল কায়দা জঙ্গি সংগঠন গড়ে তুলেছে। পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীরা মারাত্মক সন্ত্রাসবাদীদের ভারতের জেল থেকে ছাড়ানোর জন্য নেপাল থেকে ভারতীয় বিমান অপহরণ করে আফগানিস্তানের কান্দাহার বিমানমন্দরেই ঘাঁটি গেড়েছিল। তাদেরকে পাহারা দিয়েছিল তালিবান জঙ্গিরাই। মাসুদ আজহারের দল পণবন্দী বিমানযাত্রীদের বিনিময়ে মুক্ত হতে আফগানী তালিবানরা তাদেরকে নিরাপদে পাকিস্তানে পৌঁছে দিয়েছিল। আজ সেইসব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এখন ইসলামী উগ্রপন্থা দমনে সম্মেলন করছেন। একে ঠেলার নাম বাবাজী ছাড়া আর কী বলা যায়।

সূর্য ক্রমেই আলোকদীপ্ত হচ্ছেন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ খেতাব জিতলেন সূর্যশেখর গাঙ্গুলি। এশিয়ান দাবায় চাম্পিয়ন হয়ে অক্টোবরে বিশ্বদাবার আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিলেন ২৭ বর্ষীয় গ্রান্ডমাস্টার। তেহেরানে এশিয় দাবায় খেলেছিলেন ৭০ জন দাবাড়ু, যাদের অধিকাংশই গ্র্যান্ডমাস্টার এবং এলোরেটিং

২৬০০-র আশেপাশে। এহেন একটি উঁচু ক্যাটাগরির টুর্ণামেন্টে বাংলার গৌরব সূর্য যে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে এসেছেন, তা চোখ-মনের ঔজ্জ্বল্যই বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্বদাবায় হয়তো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন 'ভিসি' আনন্দ খেলবেন না। ভারতের দাবা সম্মান ধরে রাখার দায়িত্ব তাই কৃষ্ণ শশীকিরণ ও সূর্যশেখর গাঙ্গুলিকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সূর্যর সঙ্গে ওই আসরে খেলতে যাচ্ছেন আর এক বঙ্গতনয় সন্দীপন চন্দ। তিনিও তেহেরানে প্রথম দশের মধ্যে ছিলেন। হারিয়েছেন তিন গ্র্যান্ডমাস্টারকে। আর সূর্য তো অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। চারটি ম্যাচ জিতেছেন আর বাদবাকি সব ম্যাচ ড্র করেছেন। সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেঙে বেরিয়ে আসা কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান সহ চীন, ফিলিপিন্স, ইরান, ভিয়েতনামের মতো উন্নত দেশের গ্র্যান্ডমাস্টারদের টপকে সূর্য খেতাব জিতেছেন।

১৯৯১-এ কিশোর সূর্যশেখর আন্তর্জাতিক দাবায় আত্মপ্রকাশ করেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 'অনূর্ধ ১২' বিশ্বদাবার আসর সেবার বসেছিল হাঙ্গেরিতে। বালক সূর্য ওই আসরে, তৃতীয় হয়ে বিশ্বখ্যাত দাবা তাত্ত্বিক এডোয়ার্ডো গুফেল্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইউরোপের বহুল প্রচারিত চেজ ম্যাগাজিন তাকে দাবা-বিস্ময় হিসেবে অভিহিত করে। এ যেন রূপকথার মতো; ভিনি, ভিডি, ভিসি। জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক মিটে নেমেই এই সাফল্যে রচিত হয়ে যায় পরবর্তীকালের আখ্যান।

গুফেল্ড সূর্যকে ২০১০-এর বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হিসেবে প্রজেক্ট করেছিলেন। বলেছিলেন, সূর্যর যা প্রতিভা, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, খেলাটির প্রতি আবেগ, নিষ্ঠা, ভালোবাসা সর্বোপরি নিজেকে সফল

দেখার সুতীব্র জেদ, তা ঠিকমতো বাস্তবায়িত হলে ভারত একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পেতে পারে সূর্যর মধ্যে। ধাপেধাপে নিজেকে পরিমার্জিত করেছেন সূর্য। সাবজুনিয়র থেকে জুনিয়র স্তরে দেশে ও বিদেশে বহু টুর্ণামেন্টে সাফল্যের প্রভূত পালক উঠেছে তার মাথায়। সিনিয়র স্তরে এসে পরপর পাঁচবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ২০০৪-র দাবা ওলিম্পিকসে অসাধারণ সব গেম খেলে ভারতকে তুলে এনেছেন পঞ্চম স্থানে। এযাবৎ দাবা অলিম্পিয়াডে যা সর্বশ্রেষ্ঠ পারফরমেন্স ভারতের।

তার আগে গোয়ায় কমনওয়েলথ দাবায় খেতাব জিতেছেন। ইউরোপে বেশ কিছু টুর্ণামেন্টে তার পারফরমেন্স মিশ্র অনুভূতির সঞ্চার করেছে। তবে কে শশীকিরণ তার পরে শুরু করে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন সার্কিট দাবায়। তার জন্য অবশ্য সূর্যকে দায়ী করা যায় না। যার ধৈর্য কেটেছে যাবতীয় সমস্যা ও প্রতিকূলতার আবহে, বঞ্চিত হয়েছেন আধুনিক দাবা চর্চার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে, তার পক্ষে বিশ্ব দাবার তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার কষ্টিপাথরে সেঁকে নিজেকে একটা পর্যায়ে তুলে আনতে কিছুটা সময় লাগবেই। শশীকিরণ, হরিকৃষ্ণরা সাব-জুনিয়র স্তরে সূর্যর মতোই সাড়া জাগিয়ে শুরু করেছিলেন। বিশ্ব পর্যায়ে বেশ কিছু বয়স ভিত্তিক দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে পদকও পেয়েছেন। তারপর বয়ঃসন্ধিকাল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অনেক দ্রুত এগিয়ে গেছেন।

অন্যদিকে সূর্য কয়েকবছর আগে রাষ্ট্রায়ত্ত একটি তেল কোম্পানিতে উঁচুপদে চাকরির সুবাদে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে। ওই সংস্থাই তাকে ল্যাপটপ কমপিউটার কিনে দেয়। বিদেশে সব টুর্নামেন্ট খেলার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। এর ফলে বহির্বিশ্বের দাবা সংস্কৃতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়। যার সুফল ফলতে শুরু করেছে, বিগত চার-পাঁচ বছরে।

ম্যানুয়েল অ্যারনের পরপর জাতীয় সেরা হওয়ার রেকর্ড ভাঙা থেকে সাম্প্রতিক এশিয়ান দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে অপরাজিত খেতাব প্রাপ্তির মধ্যেই নিহিত সূর্যশেখরের সাফল্য ও চিন্তা চেতনার পরিশীলনের রসায়ন।

শব্দরূপ - ৫১২

শিখা দে

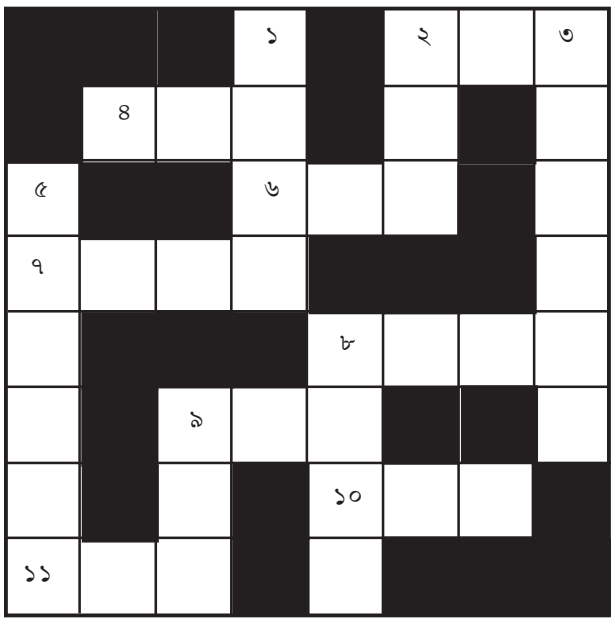

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. অর্জুনের ধনুক, আগাগোড়া এক গোলাকার ফলবিশেষ, প্রথম ঘরে দেহ, ৪. ইন্দ্রজিতের পত্নী, ৬. 'পতন-অভ্যুদয়— পন্থা'(রবীন্দ্রনাথ) পূরণীয় স্থানে অসমতল, ৭.স্ত্রী অর্থে করুণায় হৃদয় কোমল হয়েছে এমন, ৮. জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ৯. প্রতিশব্দে মীমাংসা, নিষ্পত্তি, মধ্যে জননী, ১০. জয়ের ইচ্ছা, ১১. তৎসম শব্দে হাতি, পৌরাণিক এক মুনি, প্রথম দুয়ে সম্মতি।

উপর-নীচ ঃ ১. রাধিকার মাতা, বৃষভানুরাজ-এরপত্নী, প্রথম দুয়ে কদলী, মধ্যে বটের পাখি, ২. কান্দাহারের প্রাচীন নাম, ৩. প্রতিশব্দে কুলমর্যাদা, আভিজাত্য, ৫. হিমালয়ের কোলে গাড়োয়াল অঞ্চলে হিন্দু তীর্থবিশেষ, প্রথম দুয়ে মন্দ, শেষ দুয়ে দৈহিক খাটুনি, ৮. ভরতের মাতুল, শেষ দুয়ে জয়, ৯. পতঙ্গের পূর্ণবিয়ব রূপ।

সমাধান শব্দরূপ ৫১০

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।
শৌণক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭

অ	গ	স্ত্য	মু	নি	■	■	প্র
■	দা	■	■	খুঁ	■	■	মী
■	ধ	■	■	ত	ক্ষ	শী	লা
ভৈ	র	ব	■	■	ণে	■	■
■	■	রা	■	■	ক	র	ণ্ড
হ	রি	হ	র	■	■	ঘু	■
ব	■	■	জ	■	■	ব	■
ন	■	■	ত	প	শ্চা	র	ণ

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ জুন ২০০৯ সংখ্যায়।

বয়সকেও হার মানিয়েছেন লিয়েন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মহেশ ভূপতি ভূপতিত, কিন্তু লিয়েন্ডার পেজের 'পেজ থ্রি' ইমেজ ক্রমেই জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠছে। ফাইনালে ওঠেন এবং জেতেন। যে বয়সে অন্যান্য টেনিস তারকা অবসর জীবনে ঢুকে পড়ে আরামে-বিলাসে গা ভাসিয়ে চলেন, সেই বয়সে লিয়েন্ডার দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ছুটে বেড়ান, সাফল্য ও কীর্তির নিত্যনতুন মাইলফলক রচনা করেন। বয়স তার শরীরে যেমন থাবা বসাতে পারেনি, তেমনি অদম্য প্রাণশক্তিকেও হার মানাতে পারেনি।

জীবনকে কখনও থমকে রাখতে চান না লিয়েন্ডার। টেনিস না থাকলে এই কলকাতায় দেখা গেছে লিয়েন্ডার তার আশৈশব প্রিয় ক্লাব মোহনবাগানে এসে ফিজিক্যাল ট্রেনিং নেন ফুটবলারদের সঙ্গে কিংবা সাউথ ক্লাবে কচি-কাঁচাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন টেনিসের খুঁটিনাটি সব বিষয়। স্বাস্থ্য সচেতন লিয়েন্ডার প্রতিদিন দু'ঘণ্টা নিয়ম করে জিমে কাটান দেশে ও বিদেশে যেখানে থাকুন না কেন। সুষম আহার, পর্যাপ্ত বিশ্রাম বজায় রেখে শরীরে এতটুকু মেদ জমতে দেননি। অ্যাথলেটিক ক্ষমতায় যে কোনও কমবয়সী টেনিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন। তাই যে কোনও পার্টনার নিয়েই গ্রান্ডস্লামে সফল হন।

চেক প্রজাতন্ত্রের লুকাস ডুহিকে নিয়ে একবছর ধরে সার্কিটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন লি। গতবছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জেতার পর এবছর ফরাসী ওপেনেও এই জুটির পারফরমেন্স দেখে বিমোহিত বিশ্ব। মহেশ ভূপতির সঙ্গে তার সাফল্যের রেসিপি যেসব রসায়নের ওপর দাঁড়িয়েছিল, লুকাসের সঙ্গেও তার পরতে পরতে মিল খুঁজে পাওয়া যায় এই রসায়নের। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা এবং সাফল্যের জন্য জীবনের শেষবিন্দু পর্যন্ত একবগ্গা সংকল্প নিয়ে কোর্টে নেমে লড়াই করা, তাদের দিয়ে এখনও নিত্যনতুন আখ্যান লিখিয়ে নেয় টেনিস ইতিহাসে। তবে এহেন লিয়েন্ডারের যখন মনে পড়ে তার ক্যাবিনেটে একটাও অলিম্পিক ডাবলস পদক নেই, তখন কি তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয় না? যদিও অলিম্পিক সিঙ্গল পদ আছে তার, কিন্তু মহেশকে নিয়ে চারটি অলিম্পিকে নেমে একবারও 'ভিকট্রি পোডিয়ামে' গিয়ে দাঁড়াতে পারেননি। লন্ডন অলিম্পিকে এই জুটিকে হয়তো দেখা যাবে না। এই অপ্রাপ্তির হতাশা ও শূন্যতা লিয়েন্ডারকে কুরে-কুরে খায়, তা প্রকারান্তরে বহু বার স্বীকার করেছেন তিনি। একদা বিশ্বসেরা জুটি লি-হেস, তারা ভারতকে অলিম্পিক পদক দিতে ব্যর্থ, যা মোটেই তাদের সুনাম ও রেকর্ডের প্রতি সুবিচার করে না।

৯/১১ রুখতে ২৬/১১-কে প্রশ্রয় দাও
সন্ত্রাস দমনে ওবামা'র নয়া-নীতি

অর্ণব নাগ

তারিখটা ৭ মে। সময়টা সন্ধ্যেবেলা। পাকিস্তানী টিভির পর্দায় ভেসে উঠেছে পাক-প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানীর বিষণ্ণ, নিরানন্দ মুখের প্রতিচ্ছবি। কেননা তখন পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তালিবানী বাড়াবাড়ি চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এ নিয়ে আমেরিকার তাড়া খেয়ে গিলানির সেই সময় সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা। তালিবান এবং আমেরিকা---শ্যাম রাখবেন না কূল রাখবেন, এই ভাবনায় গলদঘর্ম পাক-প্রধানমন্ত্রীকে শেষপর্যন্ত টিভি ক্যামেরার সামনে বলতেই হল যে পাক সরকার তালিবানদের বিরুদ্ধে পুরোদস্তুর যুদ্ধে (Full Scale) যাবে। এবং একইসঙ্গে তিনি পাক জনগণকে আহ্বান করলেন যে সেই যুদ্ধে তাঁরা যেন সরকারের সঙ্গেই থাকেন। কারণ এই যুদ্ধ হল 'দুশমন হামসায়া'দের বিরুদ্ধে।

'দুশমন হামসায়া' মানে বুঝতে পারলেন না তো? বুঝিয়ে দিচ্ছি। 'দুশমন হামসায়া' মানে হল প্রতিবেশি শত্রু অর্থাৎ ড্রুন্দ্বপ্লস্ত ত্ত্বন্দ্বন্দ্বড়স্প্তাব্তক্তজ ঞ্জ তামাম বিশ্ব তো অবাক! গিলানীর মুখে একি কথা? লড়াই তো তালিবানদের বিরুদ্ধে। যে তালিবানীদের একাংশ তো পাকিস্তানেরই নাগরিক (অর্থাৎ যাঁরা পাক তালিবান) আর বাকি অর্ধাংশকে নিঃসন্দেহে তাদেরই সমগোত্রীয় বলা যায় (অর্থাৎ যাঁরা আফগান তালিবান)। সুতরাং গিলানির সরকারের লড়াইটা তাদের দেশেরই একাংশ দেশবাসীর বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী শত্রুর প্রসঙ্গ আসে কোথা থেকে? আমাদের কূটনৈতিক মহল তো ঘরপোড়া গরু। তাই গিলানির কথাবার্তায় তারা সিঁদুরে মেঘের সন্ধান পেয়েছিল। কূটনৈতিক মহল সেদিনই অনুমান করেছিল, গিলানির ওই মন্তব্য প্রকারান্তরে হয়তো ভারতকেই বিদ্ধ করছে।

তাঁদের অনুমান যে এভাবে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাবে তা হয়তো সেদিন বোঝা যায়নি। বোঝা গেল, কয়েকদিন আগে যখন লাহোর হাইকোর্ট গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিল জামাত উদ্ দাওয়া প্রধান হাফিজ সঈদকে। হাফিজ সঈদ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মুম্বাই-এ গত নভেম্বরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সন্ত্রাসের মূল মাথা ছিলেন। ভারতের মাটিতে মুম্বাই-এর সেই সন্ত্রাস আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে নতুন করে ভাবতে তৎপর করেছিল। সেই তৎপরতার নমুনা হিসেবে গত ডিসেম্বরের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ জামাত-উদ্-দাওয়াকে একটি জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে। যার ফলশ্রুতিতে পাক সরকার ওই জঙ্গি সংগঠনের প্রধান হাফিজ মহম্মদ সইদকে গ্রেপ্তার করে এবং তার গৃহেই তাকে নজরবন্দী করে। জামাত-এর সঙ্গে আল-কায়দার আঁতাতের সুস্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। জামাত-উদ্-দাওয়া এই নামটি পাঠকের কাছে জঙ্গি নাম হিসেবে সেভাবে পরিচিত না হলেও এর মূল জঙ্গি সংগঠনটি একদা ধর্মীয় জঙ্গিবাদের চূড়ান্ত নৃশংসতা প্রদর্শন করেছিল। সেই মূল সংগঠনটি হল স্বনামধন্য লস্কর-এ-তৈবা। যাই হোক, এই ভাবে বন্দি হয়েই দিন কাটাচ্ছিল হাফিজ। কিছুদিন আগে পাক সরকারের প্রচেষ্টায় লাহোর হাইকোর্টের আদেশে তিনি মুক্তি পান। এবং তার এই মুক্তিপ্রচেষ্টায় হাফিজের আইনজীবী এমন সব যুক্তি সাজিয়েছেন এবং সেই যুক্তি যে বিচারকেরা গ্রাহ্য করেছেন তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র পাক আদালত বলেই! তিনি বিচারক দ্বারা গঠিত বেঞ্চের সামনে হাফিজের সেই আইনজীবীর যুক্তি ছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ খালি জামাত-উদ্-দাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে এবং এর নেতাদের শুধুমাত্র ঘোরাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সেই সঙ্গে তাঁর আরও যুক্তি, পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। কেননা ভারত জম্মু-কাশ্মীরে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশ কার্যকর করে না! এইসব আবোল-তাবোল যুক্তি দেখিয়ে সেই আইনজীবীর দাবী তার মক্কেল হাফিজ সঈদ একেবারে নির্দোষ। কিন্তু ওই বিচারকগণ কি উদ্দেশ্যে এইসব নির্বোধের মতো, কাণ্ডজ্ঞানহীন যুক্তি মেনে নিলেন তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে। বিচারকদের রায় শুনে হাফিজ কোর্টরুম চত্বরে সোল্লাসে বলে ওঠেন, 'আল্লাহ হো আকবর।"

একথা অনস্বীকার্য যে পাক প্রধানমন্ত্রী গিলানির ভারত বিরোধীতা ইদানিংকালে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে, মুম্বাই-এ ২৬/১১-এর ঘটনায় পাকিস্তানের আঁতাত নিয়ে ভারত কেবলমাত্র একখানি ফাটা রেকর্ড বাজাচ্ছে। গিলানির ভাবখানা এমন যেন ভারত খামোকা কোনও প্রমাণ ছাড়াই বারবার বলছে যে ওই ঘটনায় পাকিস্তানের হাত রয়েছে! এর পাল্টা চাল হিসেবে গিলানি পাকিস্তানের পক্ষ থেকেও ওই ধরনের একটি ফাটা রেকর্ড বাজানোর আহ্বান রেখেছেন। পাক জনগণকে আহ্বান জানিয়ে গিলানি বলেছেন যে, তাদের উচিত রাজনৈতিকভাবে, নীতিগতভাবে এবং কূটনৈতিকভাবে কাশ্মীরি জনগণকে সাহায্য করা যাতে তারা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার যাচ্ঞা করতে পারেন। সেই সঙ্গে দখলদারদের (পড়ুন ভারতের) প্রতি তাঁর সতর্কবাণী, "দমন করো না। ফল খারাপ হবে।"

অথচ পাক প্রধানমন্ত্রী যখন এহেন আচরণ করছেন তখন পাক অভ্যন্তরে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রদেশ, পাঞ্জাবের চিত্রটা কিছুটা হলেও ভিন্ন। সেখানকার আইনমন্ত্রী রাণা সানাউল্লাহ বলেছেন যদিও তাঁরা হাইকোর্টের এই রায়কে সম্মান জানাচ্ছেন কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে এর ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হবে তা মাথায় রেখে এই রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা উচ্চতর আদালতে আপীল করবেন। পাঞ্জাব প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাদেম হাসানও বলেছেন, এ বিষয়ে তাঁরা আইনজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। সরকারি সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই তাঁরা এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন।

আসলে কূটনীতির খেলায় পাকিস্তান ভারতকে নক আউট রাউন্ডেই ছিটকে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারে এখন মুখ আর মুখোশের খেলা চলছে। এদের মুখ হল পাক সরকার স্বয়ং এবং মুখোশ হল সরকারের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশ। NWFP (নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স)-এর হঠকারী সিদ্ধান্তে আফগান তালিবানদের আগমনের সূচনা সোয়েত উপত্যকায়। পাক সরকার যতই তালিবানদের ওপর হম্বিতম্বি করুক না কেন, তাদের দমন করবার সদিচ্ছে মোটেই তাদের ছিল না। যাই হোক, গিলানির টিভি সম্প্রচারের পরেই গত ৮ মে পাক সেনাবাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তারপর মোটামুটিভাবে অনেকটাই পিছু হটে যায় তালিবানরা। শেষপর্যন্ত তো পাক-সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তালিবানমুক্ত বলে ঘোষণা করেন। সম্ভবত মারা গিয়েছেন তালিবানী নেতা মৌলানা ফয়জুল্লা। যাই হোক, প্রশ্ন উঠছে, পাক সেনাবাহিনী এই যে পরাক্রম এখন দেখাচ্ছে তা আগে দেখালো না কেন? যখন সেখানে একের পর এক স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল, মেয়েদের আপাদমস্তক বোরখা পরতে বাধ্য করা হচ্ছিল, ছেলেদের জন্য শির-পরিধান ও দাড়ি-ধারণ আবশ্যক করা হয়েছিল, দেশের আইনকে কাঁচকলা দেখিয়ে শরিয়তি আইন চালু করা হয়েছিল এবং সেই আইনের বলে প্রকাশ্য রাস্তায় বেশ কিছু যুবক-যুবতীকে খুন করাও হয়েছে, তখন পাক সেনাবাহিনীর এই বিক্রম কোথায় ছিল? একি শুধু ইচ্ছেশক্তিরই অভাব নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণও রয়েছে?

এর পেছনের কারণটি যে অতীব সাংঘাতিক এতে কোনওরকম সন্দেহ নেই। পাকিস্তানের বিগ বস হল এখন আমেরিকা। সন্ত্রাস দমন নিয়ে ওবামা'-র নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন একের পর এক ভুল পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক হচ্ছে পাক প্রশাসনকে বিশ্বাস করা। অন্যদিকে পাক সরকারও আমেরিকার বিশ্বাস অর্জন করতে মরিয়া। পাকিস্তানের এই মুহূর্তে পাখির চোখ হল কাশ্মীর। পাক প্রধানমন্ত্রী গিলানির দাবী কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ওই জায়গার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। কথাটা খাঁটি সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই শান্তি প্রক্রিয়ায় নিজের কোলে ঝোল টানার জন্য গিলানি এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ও আমেরিকাকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে আজাদ কাশ্মীর কাউন্সিল আয়োজিত এক বক্তব্যে তিনি বলেছেন, 'কাশ্মীরের মানুষের জন্য পাক জনগণের মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন।" অন্যদিকে ৯/১১-র পর আমেরিকার মূল শত্রু হচ্ছে একদা তাদেরই সৃষ্টি করা তালিবানরা। তালিবানদের রুখতে আমেরিকা সব কিছু করতে পারে। আর আফগানিস্তান থেকে পাট চোকার পরে তালিবানদের নয়া ঠিকানা পাকিস্তানেরই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। তাই তালিবানদের রোখার জন্য পাকিস্তানের ওপর নির্ভর করতেই হচ্ছে আমেরিকাকে। যার দরুণ পাক-শর্ত মেনে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তারা। আর এই সুযোগটাই নিচ্ছে পাকিস্তান। একদিকে সন্ত্রাস দমন করার নামে আমেরিকার থেকে টাকা নিচ্ছে, আর সেই টাকা খরচ করছে কাশ্মীরের সন্ত্রাসে।

গত সাত বছরে ভারতে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটিয়েছে হাফিজ সঈদ। ২০০১-এ সংসদ হামলায়, ২০০৬-এর জুলাই-এ মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের পেছনে তার হাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে। ২০০২ এবং ২০০৬-এ কিছুদিনের জন্য গ্রেপ্তার হলেও পরে রহস্যজনকভাবে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। এবারও তাই ঘটল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙ্গিনায় একে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছে না আমেরিকা। আর ভুলটা হচ্ছে এখানেই। আসলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রকৃত কোন সত্তা নেই। মারসিনারী আর জেহাদি নিয়ে গঠিত পাক সৈন্যদল উগ্র মৌলবাদ সিক্ত জেহাদি সত্তারই প্রতিচ্ছবি। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, ওবামা প্রশাসন বুঝতে পারছে না, শুধু তালিবানী সন্ত্রাস রুখলেই পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসবাদ উধাও হয়ে যাবে না। সুতরাং মেনে নিতেই হচ্ছে, সন্ত্রাসদমনে আন্তরিক কোনও সদিচ্ছেই নেই আমেরিকার। যে বিশ্বাস আরও জোরদার হয়েছে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ওবামার প্রদত্ত বক্তৃতায়। সেখানে শ্রোতৃগণকে সরাসরি 'আসসালাম আলেকুম' বলে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, "কোরানে বলা আছে, আল্লাকে স্মরণ করে সর্বদা সত্যি কথা বলা উচিত। আমি আজ সেই কাজটাই করছি। ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ার যে নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা রয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তা দূর করা আমার দায়িত্ব।" তাই শুনে জনৈক এক দুর্মুখের রসিকতা, 'বারাক হুসেন ওবামাই হলেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যাঁর কথায় ও কাজে কোনও ফারাক নেই!"

Swastika
15 June - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

দক্ষিণবঙ্গ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের সমারোপ

ভারতবর্ষকে পরম বৈভবসম্পন্ন করাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য

বাসুদেব পাল।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হল, ''পরম্ বৈভবম্ নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রম্'—অর্থাৎ আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে পরম বৈভব সম্পন্ন করা। রাষ্ট্রজীবন তথা সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের মাতৃভূমিকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়াই সঙ্ঘের লক্ষ্য। অনেক সময় সংবাদমাধ্যম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সঙ্ঘ সম্পর্কে অপপ্রচার করে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করে। কিন্তু সেই সব ব্যক্তি যখন স্বয়ংসেবকদের তথা সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাদের সেই ভুল ধারণা কেটে যায়।''

গত ৪ জুন হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দির সংলগ্ন ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রথম বর্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপরোক্ত মন্তব্য করেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। এদিন শিবিরের কুড়িদিন ব্যাপী শিক্ষাবর্ষের শেষে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকদের শারীরিক ও ঘোষ (Band)-এর প্রর্দশনীর পর প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন শ্রীবিশ্বাস।

তিনি আরও বলেন, গান্ধীজী ওয়ার্ধায় সঙ্ঘ শিবির পরিদর্শন করে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা বিহীন ব্যবহার দেখে সঙ্ঘের প্রশংসা করেছিলেন। এমনকী ১৯৬২ সাল চীন যখন ভারত আক্রমণ করে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সর্বতোভাবে সরকারের পাশে দাঁড়ান। তারই ফলে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ১৯৬৩ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে যোগ দিতে সঙ্ঘকে আহ্বান জানান। প্রায় তিনহাজার স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নির্দ্ধারিত গণবেশে প্যারেডে যোগ দেন।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় সমাজবাদী নেতা লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণও বিহারে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিঃস্বার্থ সেবা কাজ দেখে স্বীয় দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করেন। ১৯৭৭-৭৮-এ সঙ্ঘের শিবিরে এসে সঙ্ঘকে যথার্থ দেশভক্ত সমাজসেবী সংস্থা বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রীবিশ্বাস আরও বলেন, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা একজন জন্মজাত দেশভক্ত ছিলেন। শিশুকালেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং কংগ্রেসেও সক্রিয় ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেননি শুধুমাত্র ইংরেজদের বিতাড়িত করলে, স্বাধীনতা এলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, নৈতিকতা, সততা এবং প্রচণ্ড দেশভক্তি ছাড়া দেশ উন্নত হতে পারে না। এজন্যই তিনি ১৯২৫ সালে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। একই কথা স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন। তিনি একহাজার মানুষ চেয়েছিলেন, পাননি। সেই মানুষ তৈরির কাজ সঙ্ঘ করে চলেছে। এদেশের নাম হিন্দুস্থান। হিন্দুদের দেশ। এদেশকে যারা নিজের মাতৃভূমি বলে মনে করে, আপন বলে ভাবে তারাই হিন্দু। হিন্দুরাই বিশ্বাস করে, একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। হিন্দু সংগঠনের কাজ কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। হিন্দুসমাজ এদেশের রাষ্ট্রীয় সমাজ। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হলেও এদেশে কিন্তু তথাকথিত সেই দুটো জাতিই থেকে গেছে। আর ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যালঘু তোষণ চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ধর্মের ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। গঙ্গাসাগরে তীর্থকর আর হজযাত্রায় ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। সঙ্ঘ কোনও ভেদাভেদ করে না। সবার জন্য কাজ করে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা দেশজুড়ে লক্ষাধিক সেবা প্রকল্প চালাচ্ছেন।

এমনকী সাম্প্রতিক আয়লাতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সবার আগে গিয়ে পৌঁছেছে। ২৫/৩০টি গ্রামে সঙ্ঘ সীমিত সামর্থ্যে কাজ শুরু করে চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্ঘ মানে 'রেডি ফর সেল্ফলেস সার্ভিস'। উপস্থিত নাগরিক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্ঘের কাজে হাতে হাত লাগিয়ে এগিয়ে আসার জন্য শ্রীবিশ্বাস আহ্বান জানান।

সভার প্রধান অতিথি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ নিতাই চন্দ্র মণ্ডল (বসু বিজ্ঞান মন্দির) তাঁর ভাষণে প্রথমেই তাঁকে আহ্বান জানানোর জন্য স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি পূর্বনির্দিষ্ট বিষয় অনুসারে ডঃ জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবনের বিভিন্ন দেশাত্মবোধক প্রেরণাদায়ী ঘটনার কথা তুলে ধরেন। সার্ধজন্মশতবর্ষে জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানিয়েছে পশ্চিমী জগৎ। এটাকে তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে অভিহিত করেন। সভার শুরুতে বর্গের সর্বাধিকারী দুর্গাদাস রায়চৌধুরী জানান, বর্গে দক্ষিণবঙ্গের ১২৯টি স্থান থেকে সমাজ জীবনের প্রায় সবক্ষেত্র থেকে ১৬৫ জন শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবক শিক্ষা গ্রহণ করলেন। সব মিলিয়ে ছাত্রদের সংখ্যাই সর্বাধিক, ১২৫ জন।

সভা পরিচালনা করেন বর্গ কার্যবাহ কাজল শিকদার। শেষে ধন্যবাদ জানান বর্গের সর্বব্যবস্থা প্রমুখ প্রিয়ব্রত সরকার। মঞ্চে ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ডঃ নিতাই চন্দ্র মণ্ডল, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস এবং বর্গাধিকারী দুর্গাদাস রায়চৌধুরী উপবিষ্ট ছিলেন।

(বাঁদিক থেকে) রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিতাই চন্দ্র মণ্ডল, অতুল কুমার বিশ্বাস ও দুর্গাদাস রায়চৌধুরী।

উত্তরবঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

বক্তৃতা দিচ্ছেন বিদ্রোহী সরকার। পিছনে বসে সতীশ বর্মন, আনন্দবর্ধন দাস, সত্যনারায়ণ মজুমদার ও সুকুমার কুণ্ডু।

সংবাদদাতা।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্ষ গত ৩১ মে শুরু হল। শিলিগুড়ির দার্জিলিং পাবলিক স্কুলে শিবিরের শুভ সূচনা হয়। ২০ দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ৯৮ জন শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষে অংশ নিয়েছেন। দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষাবর্গে পশ্চিমবঙ্গের ৮৬ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছেন। প্রথম বর্ষের বর্গাধিকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন পশ্চিম কোচবিহার জেলা সঙ্ঘচালক সতীশচন্দ্র বর্মন। দ্বিতীয় বর্ষের বর্গাধিকারী রূপে রয়েছেন শিলিগুড়ি জেলার সঙ্ঘচালক অধ্যাপক সত্যব্রত পাল। শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি ইসকন মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ আনন্দবর্ধন দাস ব্রহ্মচারী, সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। আনন্দবর্ধন মহারাজ তাঁর আশীর্বচনে বলেন, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার জন্য এমন প্রশিক্ষণ শিবিরের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, শিলিগুড়ির বিভাগ সঙ্ঘচালক সুকুমার কুণ্ডু, সতীশ চন্দ্র বর্মন, প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, সহ-ক্ষেত্র প্রচারক অজিত কুমার মহাপাত্র, প্রান্ত প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত প্রমুখ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয়প্রশিক্ষণ বর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৩ মে থেকে ৭ জুন সকাল পর্যন্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অসম এবং বঙ্গক্ষেত্রের কার্যকর্তাদের এক প্রশিক্ষণ বর্গ খড়্গপুরের নিকটস্থ গোপালী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। বর্গে দুই ক্ষেত্রের মোট ২১০ জন বিভিন্ন বয়সের কার্যকর্তা ও ৩৮ জন মা-বোনেরা ছিলেন। ওড়িশা থেকে ৫০ জন এবং অসম ক্ষেত্র থেকে ৭৮ জন কর্মকর্তা যোগ দিয়েছিলেন। বাদবাকী সকলেই পশ্চিমবঙ্গের। বর্গে যাঁরা মার্গদর্শন করেন তাদের মধ্যে ছিলেন— কোটেশ্বর রাও (অসম ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক, বঙ্গ ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক ডঃ বসন্ত রথ, অখিল ভারতীয় সম্পাদক অরবিন্দ চৌথাইবালে, পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ, সঙ্ঘের বঙ্গক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মুখ্যশিক্ষকদের দায়িত্ব পালন করেন কলকাতার সংগঠন সম্পাদক অনুপ কুমার মণ্ডল। বিকেলে রীতিমতো শারীরিক—যোগাসন, হালকা খেলাধূলা, সূর্যনমস্কার, ব্যায়ামযোগ এবং নিযুদ্ধ (ক্যারাটে)-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে নিযুদ্ধ শুধুমাত্র কমবয়সী এবং যুবকদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। বর্গে স্থানীয় এবং খড়্গপুরের সর্বসাধারণ নাগরিক ছাড়াও দিল্লীর সূর্যা ফাউন্ডেশনের বিশেষ সহযোগিতা ছিল। গত ৪।৫ জুন বর্গে ছিলেন সূর্যা কাউন্ডেশনের অধ্যক্ষ এবং প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জয়প্রকাশ আগরওয়াল। ৬ জুন বিকেলে বর্গে পৌঁছান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। ওই দিন বিকেলেই গোপালী আশ্রমে এক বৈঠকে প্রবীণভাই স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে মিলিত হন।

৭ জুন সকালে দীক্ষান্ত ভাষণের পর বর্গ সমাপ্ত হয়।

প্রশিক্ষণবর্গে নিযুদ্ধের অভ্যাস চলছে।

স্বস্তিকা
শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা

যে সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাল তখন যে জনসমুদ্র তাঁর শেষযাত্রায় ছিল, তার তুলনা নেই। দীর্ঘ দমদম রোডের ওপর মাইলখানেক লম্বা জনস্রোত বাংলার শেষ বাঘ শ্যামাপ্রসাদকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। আজও সে শ্রদ্ধা অমলিন। কমিউনিস্টদের কুৎসা, সেকুলার মতাবলম্বীদের নানা ভণ্ডামি শ্যামাপ্রসাদকে ব্রাত্য করতে পারেনি। শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ ও মতবাদ আজও সকলের প্রয়োজনীয়। এসব নিয়েই বিশিষ্ট লেখকদের তথ্যনিষ্ঠ মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ছয় টাকা।।

আগামী ২৩ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন, নতুবা বাড়তি কপি দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com